প্রকাশক :
দুলাল বস
৮/১-এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

মুদ্রাকর :
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিন্টার্স
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ

পর্যায়ক্রম

কবি ও সন্ন্যাসী



১৮৮১ সাল। রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতীর বিবাহ। পাত্র কৃষ্ণকুমার মিত্র। রাজনারায়ণের অনুরোধ, এই বিবাহোৎসবের জন্য নবীন কবি রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি সংগীত রচনা করেন। কবি হিসাবে তিনি তখন খ্যাতিমান। বাল্মীকি প্রতিভার রচনা ও অভিনয় সে সময় আলোড়ন তুলেছে কলকাতার বিদ্যোৎসাহী সমাজে। ভানুসিংহের পদাবলী এবং ব্রহ্ম সংগীতকার হিসাবেও রবীন্দ্রনাথ সমাজে সমাদৃত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিনি কনিষ্ঠ সন্তান। সুদর্শন, গৌরকান্তি সুপুরুষ। যেমন গানের গলা তেমনি লেখার হাত। অভিজাত ঠাকুরবাড়ির নবরত্নসভায় তিনি মধ্যমণি। রাজনারায়ণের অনুরোধে তিনটি গান লিখে তিনি সংগীতে যোগ দেওয়ার জন্যে আহ্বান জানান নরেন্দ্রনাথ নামক যুবককে।

জোড়াসাঁকো অঞ্চল থেকে মাইলখানেক দূরে শিমুলিয়ার অভিজাত দত্ত-পরিবারের অনিন্দ্যদেহকান্তিময় সন্তান নরেন্দ্রনাথ। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের মতো শিমুলিয়ার দত্ত পরিবার ধনী নয়, কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা আভিজাত্যে সমাজের অগ্রে। জোড়াসাঁকো বাড়ির মতোই সাহিত্য এবং সংগীতের চর্চা আছে দত্তবাড়িতেও।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর আর শিমুলিয়ার দত্তদের আদি নিবাস বর্ধমান। ঠাকুররা কুশগ্রাম আর দত্তরা কালনার লোক। ঠাকুর পরিবারের পূর্বপুরুষ যশোর ঘুরে কলকাতায় ভাগ্যান্বেষণে এসে স্থায়ী

বাসিন্দা হন। আর দত্তরা একই উদ্দেশ্যে কলকাতায় আসেন সোজাসুজি। ঠাকুর পরিবারের উজ্জ্বল রত্ন রবীন্দ্রনাথ, দত্ত পরিবারের নরেন্দ্রনাথ। চেহারায় ব্যক্তিত্বে আভিজাত্যে দু'জনেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের কলকাতায় পরিচিত নাম। পরিচিতি রবীন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ বেশি। তাঁর পিতা ভ্রাতা পিতামহ ছিলেন সেকালের কলকাতায় খ্যাতির শীর্ষে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজেও বাল্যকাল থেকে বহু গুণের আধার।

দু'জনেই প্রায় সমবয়সী। মাত্র দেড় বছরের ব্যবধান। একজনের জন্ম ১৮৬১ সালের মে মাসে। অন্যজনের ১৮৬৩ সালের জানুআরিতে। নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিজেন্দ্র-নাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের সহপাঠী বন্ধু। সেই সূত্রে নরেন্দ্রনাথের নিয়মিত যাতায়াত ঠাকুরবাড়িতে। দ্বিপেন্দ্রনাথের আসরে নরেন্দ্র-নাথ আসেন নানা বিষয়ে আলোচনা ও গল্প করতে। তিনি এলেই 'কী হে নরেন' বলে দ্বিপুবাবু তাঁকে সাদর আহ্বান জানান। দুই বন্ধুতে বড় মধুর সম্পর্ক।

নিত্য যাতায়াতের ফলেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের পরিচয়। দেবেন্দ্রনাথ প্রথম দর্শনেই পুত্রতুল্য এই যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হন। নরেন্দ্রনাথও দেবতুল্য এই মহর্ষির ধর্মাচরণ ও নীতি-নিষ্ঠায় শ্রদ্ধাবান ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বাল্যাবধি ধর্মপিপাসু। সংগীতে তাঁর আগ্রহ, কালোয়াতি গান তিনি চর্চা করেছেন প্রচুর পরিশ্রমে। স্কুল কলেজেও তিনি ছিলেন সেরা ছাত্র, কিন্তু মন বরাবর অস্থির। লোকহিত এবং ঈশ্বরচিন্তা তাঁকে সব সময় আচ্ছন্ন করে রাখে। দেবেন্দ্রনাথের মতো একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী ও ধর্মপরায়ণ মহাত্মার সংস্পর্শে এসে তাঁর মনের অস্থিরতা আপাতত শান্ত হয়। দেবেন্দ্র-নাথের ধর্মবিশ্বাস তাঁর নিজের ধর্মবিশ্বাস হয়ে যায়। দেবেন্দ্র-নাথের স্নেহের পরিবর্তে তিনি তাঁকে নিবেদন করলেন শ্রদ্ধা ও আনুগত্য। নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হলেন।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যাতায়াতের সময়ই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। শুধু ভ্রাতুষ্পুত্রের বন্ধু হিসাবে নয়, একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম এবং সুকণ্ঠ সংগীতবিদ হিসাবে নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসেন। পরবর্তিকালের দুই শ্রেষ্ঠ বাঙালীর মধ্যে প্রথম পরিচয় কীভাবে হয়েছিল, তার কোন প্রামাণিক বিবরণ কোথাও নেই; তবে একথা নানা সূত্রে জানা যায়, নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রসংগীতের একজন পারদর্শী গায়ক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁর যৌবনের সূচনাতেই। ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন উপাসনায় তিনি নিয়মিত ব্রহ্মসংগীত গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর প্রিয় গান ছিল—

সখি আমারি দুয়ারে কেন,
মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে
তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
দিবানিশি করিয়া যতন হৃদয়েতে রচেছি আসন
মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে পিত
আজ বহিছে বসন্ত পবন
তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন

স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে যাওয়ার পরও রবীন্দ্রসংগীত তাঁর কণ্ঠে ধরা ছিল। এমন কি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকেও নানা সময়ে তিনি রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শুনিয়েছেন। বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ১৪ জুলাই শোনান 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।'

সংগীতে নরেন্দ্রনাথের পারদর্শিতার কথা জানা ছিল বলেই রাজনারায়ণ বসুর কন্যার বিবাহে নবরচিত সংগীত সমবেতকণ্ঠে পরিবেশনের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আহ্বান জানান। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে তিনটি গান লিখেছিলেন—'দুই হৃদয়ের নদী', 'জগতের পুরোহিত তুমি' এবং 'শুভদিনে এসেছে দোঁহে।' রবীন্দ্রনাথ নিজে এই তিনটি গান নরেন্দ্রনাথকে শেখান এবং বিবাহসভায় সুন্দরীমোহন

দাস, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অন্ধ চুণীলাল প্রমুখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ গলা মিলিয়ে গান করেছিলেন উদাত্তকণ্ঠে। শোনা যায়, মহড়ার সময় রবীন্দ্রনাথ যখন অর্গান বাজাতেন, নরেন্দ্রনাথ বসতেন পাখোয়াজ নিয়ে। কল্পনা করুন সেই দৃশ্য, পরবর্তী কালের বিশ্বপথিক দুই মহাপুরুষ সংগীতের ছন্দে কী ঘনিষ্ঠতায় একসূত্রে গ্রথিত। দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিত। 'এক চায় একেরে পাইতে, দুই চায় এক হইবারে।'

এক হবার জন্যে দু'জনে চাইলে কী হবে, পরবর্তী কালের ইতিহাস কিন্তু অন্য রকম—দু'জনের জীবন মোড় নিল দু'দিকে, দুই হৃদয়ের নদী এক সঙ্গে গিয়ে সাগরে পড়ল না। দু'জনের উৎস একই—সেই গঙ্গোত্রী; মোহানা একই—সেই বঙ্গোপসাগর; অথচ গতিপথ রইল পৃথক, মোহানার মুখ রইল পৃথক, অশান্ত অশ্রান্ত দু'দিকে ছুটে মিলল গিয়ে একই শান্তির পারাবারে। তবু পদ্মা রইল পদ্মা, গঙ্গা রইল গঙ্গা।

উত্তর কলকাতার এক মাইল পরিধির এলাকা থেকে সমসাময়িক দুই বঙ্গ সন্তান হলেন জগৎ-বরেণ্য; জননী সারদাদেবীর সন্তান বিশ্বখ্যাত হলেন সারদা-সরস্বতীর বরপুত্র কবি হিসাবে, আর জননী ভুবনমোহিনীর সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ নামে ভুবনবিজয় করলেন সন্ন্যাসী হিসাবে। এই কবি আর সন্ন্যাসী চিন্তানায়করূপে ভারতবর্ষকে দিলেন নতুন মহিমা, ভারতবাসীর মনন ও জীবনকে দিলেন নতুন চরিত্র, ভক্তি জ্ঞান ও কর্মে খুলে দিলেন নতুন দিগন্ত; কিন্তু এত কাছাকাছি থেকেও বিবেকানন্দের জীবদ্দশাকাল পর্যন্ত দুই মহাপুরুষ একে অন্যের সম্পর্কে আশ্চর্য রকম ভাবে প্রায় নীরব। কাব্যে গানে নাটকে উপন্যাসে গল্পে রবীন্দ্রনাথ তখনই স্বদেশে খ্যাতিমান। ৩৯ বছর বয়সে ১৯০২ সালে মৃত্যুর আগেই বিবেকানন্দ দেখতে পেয়েছেন গল্পগুচ্ছের বহু গল্প সমাদৃত, মানসী, রাজা ও রাণী, সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা নবযুগের সূচনা করেছে, অথচ সর্ববিষয়ে সমান

আগ্রহী, নানা গ্রন্থ পাঠে সদামগ্ন স্বামীজি প্রত্যক্ষভাবে কোন কিছু উচ্চারণ করেন নি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সম্পর্কে। যদি বা করে থাকেন, তবে তা শ্রুতিবদ্ধ বা লিপিবদ্ধ হয় নি—একটি দুটি উক্তি ছাড়া। 'সাধনা' ও 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথ তখনই লিখেছেন অনেক সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, স্বদেশের হিত সম্পর্কে তার মতামত স্পষ্ট ও যুগান্তকারী। স্বামীজির শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবন ও সাহিত্য জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তিনি স্বয়ং ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন কাবুলিওয়ালা গল্প। স্বামীজি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এবং দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আদৌ অপরিচিত নন, তবু রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনা বা উক্তিতে প্রায় অনুপস্থিত।

আর রবীন্দ্রনাথ? স্বামীজি যতদিন জীবিত ছিলেন, নিন্দা বা প্রশংসা কোথাও কোন লিখিত উক্তি করেননি বিবেকানন্দ সম্পর্কে। করে থাকলেও তার কোন রেকর্ড নেই। বিশাল কর্মময় জীবন স্বামীজির। তার অভীমন্ত্রে সারা বিশ্ব তোলপাড়, পরাধীন ভারত নব আশায় বলীয়ান, আসমুদ্র হিমাচলের সর্বত্র স্বামী বিবেকানন্দ নামটি মন্ত্রের মতো কাজ করছে, আমেরিকা জয়ের পর কলকাতা শহরে প্রবল উত্তেজনা, কিন্তু সর্ববিষয়ে সদাজাগ্রত রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে যেন তেমন অগ্রণী নন। তাঁর কলম দিয়ে অজস্র রচনা অনর্গল উৎসারিত হচ্ছে, সভাসমিতি অনুষ্ঠানে তিনি একজন প্রখর বক্তা, তবু সমসাময়িক কোন রচনা বা বক্তৃতায় বিবেকানন্দের নাম সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত। তিনি যা কিছু বলেছেন, সবই বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর।

এই প্রহেলিকার উত্তর স্পষ্টভাবে আজও কেউ দিতে পারেন নি। নানাজনে নানা কারণ ব্যাখ্যা করেছেন বটে, কিন্তু কোন সদুত্তর মেলে নি। হয় জোড়াতালি দেওয়া গোঁজামিল, নয় পক্ষপাতপূর্ণ বিকৃত বিশ্লেষণ। এক পক্ষের উকিল সেজে এমন সব কারণও কেউ কেউ দেখিয়েছেন, যাতে একজনের গৌরববৃদ্ধি দূরে থাক, অপমান হয়েছে

দুই মনীষীরই। এই প্রসঙ্গে রসনাতৃপ্তিকর জনশ্রুতিও ক্ষতি ঘটিয়েছে দুইজনের সম্পর্কে আপাতপার্থক্যের মূল অনুসন্ধানে। এমন কথাও বলা হয়েছে যে, এককালে জোড়াসাঁকো বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ স্বামীজি নাকি ঠাকুর পরিবারের কোন সুন্দরী রমণীর পাণিপ্রার্থী হয়ে বিফল হওয়ার জন্যই রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিদ্বিষ্ট হন। আবার অন্য দিকে রটনা করা হয়ে থাকে যে, রবীন্দ্রনাথ স্বামীজির খ্যাতিতে এতই ঈর্ষান্বিত হন যে, উদাসীন থেকেই তিনি সেই খ্যাতিকে ইচ্ছাকৃত-ভাবে অবজ্ঞা করেছেন। এ সবই অপপ্রচার, সবই অমূলক।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই উদাসীনতা অবশ্য সাময়িক। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের লিখিত উক্তি অজস্র। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মহত্ব ও ব্যক্তিত্ব কবি রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু জানি না কেন বিবেকানন্দের জীবদ্দশায় তিনি কোন উক্তি প্রকাশ্যে করেন নি। এমন কি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বংকিমচন্দ্র, নিবেদিতা সম্পর্কে যতটা উচ্ছ্বসিত, ততটা বিবেকানন্দ সম্পর্কে পরেও তিনি নন। তবু কাগজপত্র ঘাঁটলে পরিষ্কার জানা যায়, বিবেকানন্দকে রবীন্দ্রনাথ কী পরিমাণ শ্রদ্ধা করতেন। অথচ দুর্ভাগ্য রবীন্দ্রনাথেরই, দীর্ঘদিন ধরে একটা অপপ্রচার চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে যে তিনি বিবেকানন্দ সম্পর্কে বরাবর সম্পূর্ণ নীরব এবং এই নীরবতাই যেন রবীন্দ্রনাথের নীচতার লক্ষণ। তর্কের খাতিরে বলা যায়, বিবেকানন্দ সম্পর্কে কোন কিছু না বললেও রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব কমে না। কারণ রবীন্দ্রনাথ এমন কোন দাসখৎ দিয়ে জন্মগ্রহণ করেননি যে, তাঁকে তাঁর পূর্বসূরী উত্তরসূরী সমসাময়িক—সকলের সম্পর্কে প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করতে হবে।

বিবেকানন্দ অবশ্য পরোক্ষভাবে এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষই করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নাম খোলাখুলি না করলেও বোঝা যায় 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে স্বামীজি যে সব কবিকে

নিয়ে ঠাট্টা করেছেন, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথও আছেন। তিনি লিখছেন—'ঐ যে এক দল দেশে উঠেছে, মেয়েমানুষের মত বেশভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় 'হাসেন-হোসেন' করেন।'

বিবেকানন্দের এই উক্তি একপেশে, তবে অকারণ নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর সে সময়কার উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা পরে লিখেছেন। 'জীবন-স্মৃতিতে' তিনি বলেছেন, সে সময় কিছুকালের জন্য তাঁর একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এতো একটা সাময়িক ব্যাপার। স্বামীজি-অন্ত প্রাণ ভগিনী নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। নিবেদিতা মারফৎ স্বামীজি কি রবীন্দ্রনাথের তেজস্বী রচনাবলী পড়েন নি? আর মেয়েলিপনার কথাই যদি ধরা যায়, স্বামীজির প্রিয় 'মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে' গানে তো তেজস্বিতার নামগন্ধও নেই। ক্ষিতিমোহন সেন নিজে কাশীতে স্বামীজির মুখে এই গানটি শুনেছিলেন। তাছাড়া স্বামীজি সম্পাদিত 'সংগীত কল্পতরু' গ্রন্থে এই রকম বেশ কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত স্থান পায়। তবে এগুলো বাইরের ব্যাপার, কর্মব্যস্ত বিবেকানন্দ তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে যদি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ নাও করেন, তাতেও বিবেকানন্দের মহত্ব বিন্দুমাত্র কমে না। রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ হওয়ার আগেই স্বামীজি মহাপ্রয়াণ করেন।

তবে এহো বাহ্য এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখ স্মরণীয়। রোমাঁ রোলাঁর ভারতবর্ষের দিনপঞ্জী গ্রন্থে আছে, ওকাকুরা গঙ্গার ধারে বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করলে স্বামীজি তাঁকে বলেন, এখানে আমার সঙ্গে আপনার কিছুই করণীয় নেই। এখানে তো সর্বস্ব ত্যাগ। আপনি রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে যান। তিনি জীবনের মধ্যে

আছেন। ওকাকুরাকে বিবেকানন্দের কাছে পাঠান রবীন্দ্রনাথ। আবার সেই ওকাকুরাকে রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতে বলেন বিবেকানন্দ।

আমাদের আর একটি জিজ্ঞাস্য, নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ-আলাপ অনেকবারই হয়েছে বটে, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের মিলন কোথাও হয়েছে কি? জানা যায়, হয়েছে। তার আগে বলা দরকার, নরেন্দ্রনাথের নাম বিবেকানন্দ কী করে হল? রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর সন্ন্যাস গ্রহণ করে নরেন্দ্রনাথ নাম নেন, বিবিদিশানন্দ। নাম পরিবর্তনের পিছনে একটি জনশ্রুতি আছে। কেশবচন্দ্র সেনের অনুচর ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের 'নব-বৃন্দাবন' নাটকের বিবেক চরিত্রে অভিনয় করেন নরেন্দ্রনাথ। ১৮৮৩ সালের ১৮ জানুআরি। সম্ভবত এই স্মৃতি থেকেই বিবিদিশানন্দ বিবেকানন্দ হন।

রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ সাক্ষাতের কথা বলছিলাম। শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দিয়ে বিবেকানন্দ যখন কলকাতায় ফেরেন, তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জানান নগরবাসী। ১৮৯৭ সালের ২৮ ফেব্রুআরি শোভাবাজার বাড়িতে অনুষ্ঠিত সম্বর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। এই উপস্থিতির কথা রবীন্দ্রনাথ নিজে অমল হোমকে বলেছিলেন। তাছাড়া ১৮৯৯ সালের ১৭ জানুআরি একটি চায়ের আসরে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ মিলিত হন। দু'জনে কী কথাবার্তা হয়েছিল জানা যায় নি, তবে নিবেদিতার এক চিঠিতে জানা যায় ওই আসরে রবীন্দ্রনাথ তিনটি গান করেন। তাছাড়া হয়তো আর দু-এক জায়গায় সাক্ষাৎ হয়েছে, কিন্তু তার কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য নেই। নিবেদিতা ছাড়াও কবিবন্ধু দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গেও স্বামীজির অন্তরঙ্গতা ছিল।

স্বামীজি দেহরক্ষা করেন ১৯০২ সালে। তাঁর প্রয়াণের পর কলকাতায় একটি শোকসভা হয় ভবানীপুরে। ১৯০২ সালের ১২ জুলাই এই সভায় বক্তৃতা দেন ভগিনী নিবেদিতা, আনন্দচরণ মিত্র

প্রমুখ এবং সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বাংলায় স্বামীজির জীবন ও বাণী সম্পর্কে একটি দীর্ঘ ভাষণ দেন। আক্ষেপের বিষয়, তাঁর এই মূল্যবান বক্তৃতার বিস্তারিত বিবরণ আজো জানা যায় নি। তবে ১৯০২ সালের ১৫ জুলাই 'বেঙ্গলি' দৈনিকে এই সভার একটি বিবরণ বেরিয়েছিল। সংবাদদাতা লেখেন—

On Saturday (12 July 1902) last the Excelsior Union of Bhowanipur held a meeting to do honour to the memory of the Late Swami Vivekananda. There was a large gathering of the student of the locality in the spacious hall of the South Suburban School, and Babu Rabindranath Tagore presided. The speaker of the evening Sriman Ananda Charan Mitra, one of the Vice-Presidents of the Union, gave expression to the deep regard in which the Swamiji was held by the whole community and exhorted his admirers to worship his memory not in the Western way of erecting a statue or hanging a portrait but by treasuring up his teaching in the recesses of their hearts and endeavouring to live up to that exalted ideal which had so moved even the materialistic West. At the request of the secretary Sister Nivedita explained to the meeting the secret of the Swamiji's success in the Western world and emphasised in her own inimitable way that absolutely fearless patriotism which was the most striking feature of the great Swamiji's character bringing into

strong contrast the ague fits by which the average Bengali is convalsed at the last imaginings of any danger into which his country's cause may lead him. The president having summed up the Swamiji's work and teachings on much the same line in Bengali, the meeting was brought to a close.

সংবাদদাতা লেখেন, রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দকে শাশ্বত ভারতের চিরস্মরণীয় মহাপুরুষদের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে নানাভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ১৯০৮ সালে স্বামীজি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এক সভায় বলেন 'অল্প দিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।' (দ্রষ্টব্য : পূর্ব ও পশ্চিম—প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৫)

ডাঃ সরসীলাল সরকারকে ১৯২৮ সালের ৯ এপ্রিল লেখা এক চিঠিতেও (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫) রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রশস্তি-বাক্য লিপিবদ্ধ করেছেন। বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্পর্কে তিনি লেখেন—'আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি, দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে

জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্র ত্যাগে ফলেছে। তার বাণী মানুষকে যখনই সম্মান দিয়েছে, তখনই শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোন দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণমনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যে-সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই, তার মূলে আছে সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়।'

স্বামী অশোকানন্দকে লিখিত এক পত্রে বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "বিবেকানন্দ বলেছিলেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি। বলেছিলেন দরিদ্রের মধ্য দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান। একে বলি বাণী। স্বার্থবোধের সীমার বাইরে মানুষের আত্মবোধের সীমার বাইরে মানুষের আত্মবোধকে অসীম মুক্তির পথ দেখান। এতে কোন বিশেষ আচরণের উপদেশ নয়, ব্যবহারিক সংকীর্ণ অনুশাসন হয়।" (কিশোর বাংলা ১৩৪৮ পৌষ)।

ডঃ আলেকস আরনসন লিখিত 'রোলঁ্যা অ্যাণ্ড টেগোর' বইয়ে রবীন্দ্রনাথের মুখে বিবেকানন্দের ভূমিকা সম্পর্কে রোলঁ্যা এবং রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই অনেক আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে একটি আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে বিবেকানন্দের চিন্তার তফাৎ কোথায় এবং বিবেকানন্দের বক্তব্যের মূল সুর কী, ব্যাখ্যা করেছেন। রোলঁ্যাকে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'বিবেকানন্দের আইডিয়া ছিল জীবনের বাস্তবকে স্বীকার করা। আমাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা—যেখানে সৎ অসৎ কিছুই নেই—তার উপরে উঠতে চায়-ই। সৎ-অসৎ বা ভালমন্দের বাইরে আসতে গিয়ে আধ্যাত্মিকতার সম্পর্কহীন ধর্মীয় অনেক আচার অভ্যাস বিবেকানন্দ মেনে নিতে পারতেন। সত্যের প্রতি আমার মনোভাব একটু আলাদা রকমের। যা স্পষ্টত মন্দ, তাকে সত্য বলে মানা যায় না। সূর্যের আলোতে বিষ-বীজাণু থাকা অসম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে একটি সুস্থ

অসহিষ্ণুতার অভাবে আজ আমাদের ধর্মজীবন প্রগতিশীল বা সৃজ্যমান হতে পারছে না। বরং এক ধরনের অনীশ্বরতাবাদ ভারতের পক্ষে কল্যাণজনক হতে পারে। কারণ আমি জানি যে, আমাদের দেশ এই অনীশ্বরতাবাদকে কখনই চিরকালের জন্যে গ্রহণ করবে না। এই সুস্থ বলিষ্ঠ মতবাদ ধর্মারণ্যের অবাঞ্ছিত আবর্জনারাশি উচ্ছেদ করবে এবং মহীরূহরাই অক্ষত থেকে যাবে।'

জাপানী মনীষী ওকাকুরা এসেছিলেন ভারতবর্ষকে বুঝতে, ভারতবর্ষকে জানতে। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে এই বিষয়ে পরামর্শ চাইলে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ভারতবর্ষকে যদি জানতে চান, বিবেকানন্দকে জানুন; —If you want to know India, study Vivekananda. There is in him, everything positive, nothing negative.

এর চেয়ে বড় শ্রদ্ধার্ঘ আর কী হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যে স্বামীজির বাংলা রচনায় গুণগ্রাহী ছিলেন, তার প্রমাণও আছে। স্বামীজির প্রায় সব ক'টি বই তিনি মন দিয়ে পড়েছিলেন। শুধু চিন্তা-ধারার জন্য নয়, তাঁর প্রাঞ্জল গদ্যরীতিও রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। বিশেষ করে 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।' ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনকে তিনি বইগুলির গুণের কথা অনেকবার উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ দীনেশ সেন মশায়কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সম্পর্কে এক চিঠিতে লেখেন, "আপনি এখনি গিয়ে বিবেকানন্দের এই বইখানি পড়বেন। চলিত বাংলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে পারে, তা পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি আর পূর্ব ও পশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।" (উদ্বোধন সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা ১৩৫৪ মাঘ)। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সর্বপ্রথম বিশ্বভারতীতেই রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পাঠ্যগ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হয়।

রবীন্দ্রনাথ স্বামীজি প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠেও গিয়েছেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সব দেখেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে সেই বিখ্যাত 'বহু সাধকের বহু সাধনার-ধারা' কবিতা রচনা ছাড়াও ১৯৩৭ সালে রামকৃষ্ণদেবের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মমহাসভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু তাই নয়, কিশোর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে রামকৃষ্ণ মিশনের দুই সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি পদব্রজে বদরিকাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মিশনের প্রতি বিন্দুমাত্র বিরূপতা থাকলে নিজের নাবালক ছেলেকে সন্ন্যাসীর সঙ্গে এইভাবে কঠোর পরিশ্রমের পথে তিনি পাঠিয়ে দিতেন না। রামকৃষ্ণ কথামৃত চতুর্থ খণ্ড থেকে আমরা জানতে পারি কাশীশ্বর মিত্রের বাগান বাড়ি নন্দন কাননে ১৮৮৩ সালের ২মে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রনাথ ও আরো কয়েকজন তাঁকে গান গেয়েও শোনান। শ্রীম লিখছেন, "ঠাকুর প্রথমে আসিয়া নীচে একটা বৈঠকখানা ঘরে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে ঘরে ব্রাহ্ম ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া একত্রিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরবংশের ভক্তগণ এই উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। সংগীত শুনিয়া ঠাকুরের আনন্দের আর সীমা রহিল না।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিবেকানন্দ বা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি অশ্রদ্ধা থাকলে বিবেকানন্দগতপ্রাণ নিবেদিতা কি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এতো ঘনিষ্ঠ হতে পারতেন? তাছাড়া আরো স্মরণীয়, সন্ন্যাসী হওয়ার পরও স্বামীজি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে যান। দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী হেমলতা দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় বলছেন, 'আমার মনে আছে শিকাগো পার্লামেণ্ট অব রিলিজিওন থেকে ফিরে এসেই বিবেকানন্দ জোড়াসাঁকো এসে মহর্ষির সঙ্গে দেখা করেন। পাশ্চাত্য বিজয়ের সংবাদে উল্লসিত মহর্ষিও বিবেকানন্দকে একখানা সস্নেহ পত্র পাঠান।'

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নব্য হিন্দু ধর্মের যে জোয়ার বাংলা দেশের দুই কূল প্লাবিত করেছিল, তার মূলে আছেন রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ। আর ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম, বিবেকানন্দ কায়স্থ সন্ন্যাসী,—জীবনদর্শন ও ধর্মচিন্তার দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে দু'জনই হিন্দুত্বের জয়গান গেয়েছিলেন। দু'জনেই ছিলেন জাতিভেদের বিরোধী, কিন্তু বর্ণাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা মেনে নেন। তাঁদের যুক্তির পিছনে ছিল ইতিহাস, সমাজদর্শন ও আধ্যাত্মিকতা। দু'জনেই জাগ্রত করতে চেয়েছেন আত্মশক্তিকে। মূঢ় কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুয়ানি বা আর্যামির পরিহাসে দু'জনেই সমান প্রখর। স্বদেশের হিত কোথায়, তার বিশ্লেষণে কবি ও সন্ন্যাসীর মধ্যে বিশেষ তফাৎ নেই। শাস্ত্রের শাসনে আড়ষ্ট সমাজ ও ধর্মকে মুক্তি দেবার জন্যে কলম ধরেছেন দুই মনীষী। বিবেকানন্দ এই মুক্তির বাণী প্রচার করতে গিয়ে জনসেবাকে করলেন মুখ্য হাতিয়ার। রবীন্দ্রনাথ মুক্তি চেয়েছিলেন সেবা নয়, সংস্কারের মাধ্যমে। রিলিফ নয়, রিফর্ম। এই সংস্কার আবার কোন প্রতিষ্ঠান করে নয়, মানুষের আত্মশক্তি ও আত্মসম্মানকে জাগ্রত করে। রবীন্দ্রনাথ সর্বদা বলতে চেয়েছেন ওই একটি কথা—'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির।'

১৯০২ সালে স্বামীজির মহাপ্রস্থান। সেই বছরই রবীন্দ্রনাথের পত্নীবিয়োগ। তিনি তখন ব্যক্তিগত শোকের ভিতর দিয়ে আরো নিঃসঙ্গ। তারপর পর পর মৃত্যু—কন্যা রেণুকা, পিতা দেবেন্দ্রনাথ ও পুত্র শমীন্দ্রনাথের। ১৮৮৭ সালে বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হন। তাঁর কর্মকাল মোটামুটি পনেরো বছর। স্বল্পায়ু জীবনের স্বল্প পরিসরে তিনি ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন দেশে বিদেশে।

তিনি যখন পরিব্রাজক হয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ভারতের গৌরব-গাথা, বেদান্তের মহিমা এবং সমাজ রাষ্ট্র, অর্থনীতি, ধর্ম নিয়ে প্রবল বেগে আবেগের সৃষ্টি করে চলেছেন আসমুদ্রহিমাচলে, তখন

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শহর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন গ্রামে। তাঁর চিন্তা অন্যত্র প্রসারিত। সারা পৃথিবী যখন স্বামীজির প্রেরণায় তোলপাড়, ঠিক সেই সময়, স্বামীজির কর্মযজ্ঞের সেই পনেরোটি বছর তিনি অন্য এক নীরব কর্মযজ্ঞে হাত দিয়েছেন শিলাইদহে, পতিসরে, সাজাদপুরে। তিনি তখনই প্রথম দেখলেন প্রকৃত ভারত মাতাকে, জানলেন ভূমি-লক্ষ্মীকে। গ্রামকে না বাঁচালে যে দেশ বাঁচে না, শহরে বসে কথার ফুলঝুরি না ছড়িয়ে চাষীদের মূঢ় ম্লান মুখে হাসি ফোটানোই যে বেশি জরুরী, একথাটা রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন সেই সময়টাতে এবং সমবায় কৃষিব্যাঙ্ক, ট্র্যাক্টর মণ্ডলীপ্রথা ইত্যাদি নিয়ে তিনি তখন মহাব্যস্ত। শিলাইদহের পর ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে শুরু করেন নতুন এক কর্মযজ্ঞ। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ এবং ভারতীয় প্রথায় শিক্ষা—এই ছুটি প্রাথমিক কর্তব্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন প্রবল উৎসাহে। ছুটি কর্তব্য পালনের মূলে ছিল স্বদেশবাসীকে চিন্তায় ও কর্মে বলীয়ান করা, ভিখারীর মনোভাব পাল্টে আত্মশক্তির উদ্বোধন করা।

রবীন্দ্রনাথ আপন মনীষা, কর্মশক্তি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে যে নতুন জগতের সন্ধান পেলেন, তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠল তাঁর চিন্তাধারা ও রচনায়। ইতিমধ্যে স্বামীজিও তাঁর লোকোত্তর প্রতিভায় তৃতীয় নয়নে দৃষ্টিপাত করলেন স্বদেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে। বিভিন্ন চিঠি রচনা ও বক্তৃতায় তিনি দেশহিত সম্পর্কে যা বললেন, তা অনেক পরে প্রায় একই ভাষায় বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাস বা ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা প্রবন্ধে যা বলেছেন, তার অনেক আগে স্বামীজি তা বলেছেন তার 'হিস্ট্রিক্যাল ইভলিউশন অভ্ ইণ্ডিয়া' নিবন্ধে। বিশ্লেষণ ও বিচারে কী আশ্চর্য সাদৃশ্য। স্বামীজি বলেছেন—"প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বযুগেই মননশীলতা ও আধ্যাত্মিকতা জাতির প্রাণকেন্দ্র ছিল.

রাজনীতি নয়। মুনি-ঋষি এবং আচার্যগণ যে সকল শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করিতেন, সেগুলিকে অবলম্বন করিয়াই জাতীয় জীবন উচ্ছ্বসিত হইত' (বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড)। আর রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—'ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফতর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়-পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন 'যেখানে পলিটিক্স নাই সেখানে আবার হিস্ট্রি কিসের, তাঁহারা ধানের খেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না।...ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম। তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে। তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই—ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।'

রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেন, 'আমি গুরু নই', তেমনি বিবেকানন্দ বলেছেন, 'তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নন, দার্শনিকও নন, সাধকও নন—আমি গরিব, আমি গরিবদের ভালোবাসি।' কারণ তিনি জানতেন, 'ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র শেখানো তাহাকে অপমান করা।' বিবেকানন্দ পূজা করতে চেয়েছেন নরনারায়ণকে। নানা সময়ে নানাভাবে বারবার এই দরিদ্র ভারতবাসী, অপমানিত ভারতবাসী, বঞ্চিত ভারতবাসীর কথা অতিশয় বেদনার সঙ্গে তিনি বলেছেন। বিক্ষিপ্ত সেই বিবেকবাণী রবীন্দ্রনাথ পরে কবিতার আকারে বলেছেন একই বেদনার সঙ্গে। 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

'শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার'

—তখন মনে হয় বিবেকানন্দের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েছেন রবীন্দ্রনাথও। বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম 'নরনারায়ণের' কথা বলেন।

বিবেকানন্দ বলেছেন, 'সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।…এমন সময় আসিবে যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে …শূদ্রধর্মকর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।' একই কথা রবীন্দ্রনাথ পরে বলেছেন অন্যভাবে। 'রথের রশি' নাটকে তিনি ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয় নয়, বৈশ্য নয়, জগন্নাথের রথ নড়িয়েছেন শূদ্রের হাতের টানে। বিবেকানন্দ উচ্চ বর্ণের লোকদের বার বার বলেছেন, অসহায় নির্যাতিতের সহযাত্রী হতে, নইলে তাদের ক্রোধে সব জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে। মুচি মেথর চণ্ডাল দুঃস্থ দরিদ্রকে ভাইয়ের মতো ভালোবাসার জন্যে তিনি বারবার বলেছেন। বলেছেন অপমানিতের সঙ্গে একাসনে বসতে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথও বিবেকানন্দের বাণী কাব্যের আকারে গেঁথে বলেছেন—

'যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।'

স্বামীজির মৃত্যুর আট বছর আগে লেখা 'এবার ফিরাও মোরে, কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ-অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ ফল। তিনি বলেন—

'বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার,
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই প্রাণ চাই আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল চাই স্বাস্থ্য আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য মাঝারে, কবি।
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।'

বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে এই একই কথার প্রতিধ্বনি পংক্তিতে পংক্তিতে।

'ভারততীর্থ কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, তা বিবেকানন্দেরই বাণী। যেন তাঁরই উদাত্ত রচনার কাব্যরূপ। উদার ছন্দে পরমানন্দে নরদেবতারে নমস্কার করে সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে তিনি ব্রাহ্মণকে যেমন মন শুচি করে সকলের হাত ধরতে বলেছেন, তেমনি পতিতদেরও আহ্বান জানিয়েছেন সব অপমানভার অপনীত করে এগিয়ে আসতে। তাছাড়া বিবেকানন্দের মতোই তিনি এই মহাভারতে মহামানবের সাগর তীরে পূর্ব ও পশ্চিমকে মিলিয়েছেন, বলেছেন,—'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।'

বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষির উন্নতি ছাড়া দেশের উন্নতি যে অসম্ভব এবং ভারতের প্রাণ পল্লীগ্রামেই—একথা নগরে লালিত কবি ও সন্ন্যাসী একই সুরে বলেছেন। হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে দু'জনের মনোভঙ্গী এক। শিল্পকলা, শিক্ষা, লোকসংস্কৃতি, নারী-জাগরণ, সংগীত, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে দু-জনের যেমন সমান আগ্রহ, তেমনি আগ্রহ বিজ্ঞান সম্পর্কে। তাছাড়া দু-জনেই মনে করতেন সমস্ত শিক্ষা আনন্দময় হওয়া উচিত, হওয়া উচিত স্বয়ম্ভরী।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে গোরার চারিত্রিক তেজস্বিতা ও বলিষ্ঠ কথাবার্তায় স্বামীজির ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। স্বামীজি বলেন—'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষী, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করবে।' অন্যদিকে গোরার উক্তি—'ভারত-বর্ষের পরিবর্তন ভারতবর্ষের পথেই হওয়া চাই। হঠাৎ ইংরাজি ইতিহাসের পথ ধরলে আগাগোড়া সমস্ত পণ্ড ও নিরর্থক হয়ে যাবে।'

কবি ও সন্ন্যাসী দু-জনের মুখেই চরৈবেতি মন্ত্র। বিবেকানন্দ বলেন, 'তুচ্ছ জীবন তুচ্ছ মরণ তুচ্ছ ক্ষুধা তুচ্ছ শীত।...পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে সম্মুখে।' রবীন্দ্রনাথ বলেন,—

'চাব না পশ্চাতে মোরা মানিব না বন্ধন ক্রন্দন।
হেরিব না দিক।
গণিব না দিনক্ষণ,
করিব না বিতর্ক বিচার, উদ্দাম পথিক।'

প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য গ্রন্থে স্বামীজি বলেছেন, 'অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার করো। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ। নৈবেদ্য গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের মুখে একই কথা—

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।'

স্বামীজি বলেন,—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমা ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বলে—

যেথায় থাকে সবার অধম
দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে সবার নীচে
সবহারাদের মাঝে।

শিক্ষা সম্পর্কে স্বামীজির বক্তব্য—The only service to be done for our lower classes is to give them education to develop their lost individuality. আর রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য—'দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে।'

তবু রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ, তবু বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ। দুই মনীষীর জীবন রেলপথের মতো সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়েছে, কখনো পরস্পর এক সূত্রে মিলিত হয় নি। না হওয়ার মূলে রয়েছে

দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। চিন্তাধারার মিল আছে বটে, কিন্তু একজনের জীবনধারা অন্যজনের জীবনধারার অনুরূপ নয়। কবি রবীন্দ্রনাথের চিত্তে সন্ন্যাসীর ছায়া বারবার পড়লেও তিনি আজীবন কবিই থেকে গেছেন, জগতের আনন্দযজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে বাঁশি বাজিয়েই গিয়েছেন এবং প্রাণের কান্না হাসি গানে গানে গেঁথেই মানবজীবন ধন্য করেছেন। আর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের চিত্তে কবির ছায়াপাত ঘটলেও তপস্যার আসন থেকে তিনি কখনো সরে আসেন নি। একজন মূলত সৌন্দর্যের পূজারী, অন্যজন তপস্বী সাধক। এতো নৈকট্য, এতো সাদৃশ্য সত্ত্বেও কবি আর সন্ন্যাসীর মূলগত পার্থক্য তাই কখনো ঘোচেনি। দেশপ্রেমী, মানবপ্রেমী হয়েও বিবেকানন্দের অধিষ্ঠান যোগাসনে। আর রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার। বৈরাগ্যসাধনে তিনি মুক্তি চান না। মুক্তির স্বাদ তিনি পেতে চান মহানন্দময় অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে।— তিনি বলেন 'মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া, প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফেলিয়া।'

যদিও বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ দু-জনেই একবাক্যে বলেছেন,—

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে
যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গ সম
তোমার আদেশে।'

তবু সকল কর্মের অবসান ঈশ্বরের কাছে দু-জনের প্রার্থনা দু-রকম।

কাব্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে মহৎ বাণী প্রচার করেছেন, কবি জীবনে তা স্পষ্টত প্রকাশ পায় নি। তার কারণ রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রের দূত, রবীন্দ্রনাথ জীবন-শিল্পী। তাঁর আদর্শে ধর্মপ্রচার

নয়, গুরুবাদও নয়। সন্ন্যাসের নীরস আধ্যাত্মিকতা তাঁর শিল্পী-সত্তাকে জাগ্রত করতে পারেনি। ধর্মশক্তি ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনই তাঁর কাম্য ছিল। তাঁর পৌরুষের পিছনে অনবরত বেজেছে সংগীত।

আর্যামির নিন্দায় দু'জনেই প্রখর, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দু'জনেই খড়্গহস্ত, বীররসে দু'জনেই দীপ্যমান, প্রাচীন ভারতের গৌরব-প্রচারে দু'জনেই মুক্তকণ্ঠ, পাশ্চাত্যের ভাবধারা গ্রহণে দু'জনে সমান উদার, এবং স্বদেশের হিত দু'জনের চিন্তার পুরোভোগে —সবই সত্য: কিন্তু ধর্মাদর্শ ও জীবনদর্শনে দু'জন দুই কোটির মানুষ। বিবেকানন্দ ভাবপ্রবণ হলেও ভাব নিয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না, সংগীত ভালোবাসতেন বটে, কিন্তু সংগীতের মূর্ছনায় মূর্ছা যেতেন না। কঠোর শৃঙ্খলাকে তিনি অগ্রধিকার দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ধার্মিক হয়েও ধর্মসম্প্রদায় গঠনে উৎসাহী ছিলেন না। বিবেকানন্দের মতো কোন নির্দিষ্ট মতবাদ তিনি প্রচার করতে চান নি। নানা বিশ্বাস নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে তিনি অবশেষে জয়গান করেছেন মানুষের ধর্মের। রক্ষণশীল হিন্দু মনোভাব তো নয়ই, ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ণ মতবাদের মধ্যেও তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই দিকটা চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লিখছেন—

'স্বদেশ ও ধর্মের জন্য বিবেকানন্দের অনির্বাণ প্রেমবহ্নি বাংলা-দেশের যুবমনকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল। ত্যাগের জন্য কর্মের জন্য একদল মানুষ সর্বদাই উন্মুখ। কেবল আহবানের জন্য তাহাদের প্রতীক্ষা। তাহারা নেতৃত্ব করিতে চাহে না, তাহারা নেতাকে অনুসরণ বা গুরুকে অনুকরণ করিয়া সার্থকজীবন করিতে চাহে। সেই নির্ভরশীল নেতা অনুগামী কর্মপিপাসুরা গভীর আন্তরিকতা লইয়া এই নবীন সন্ন্যাসীর পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যাহারা 'জীবনমৃত্যু পায়ের

ভৃত্য' বলিয়া অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ছিল, তাহাদের অধিকাংশই বিবেকানন্দের বাণীর দ্বারা উদ্দীপ্ত। আবার একদল রবীন্দ্রনাথের দ্বারা উদ্বোধিত হইয়া বলিয়াছিল—

'এবার চলিনু তবে
সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ সম্প্রদায় বা দল গঠনে যে সমর্থ হন নাই, তাহার কারণ তাঁর চরিত্রের মধ্যেই ছিল। মানুষকে পরম আত্মীয় করিবার জন্য যে পরিমাণে হৃদয়াবেগ থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, কবির মধ্যে তাহা সেই পরিমাণে ছিল না। একটা জায়গা পর্যন্ত তিনি মানুষকে কাছে টানিতে পারিতেন, সেটি সম্পূর্ণ বুদ্ধি ও বিচারের ক্ষেত্রে। তাঁহার সঙ্গে কেউ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তৃপ্ত হইতে পারিত না। কবির এই কঠোর নৈর্ব্যক্তিক মানবপ্রীতির জন্য তাঁহার অন্তরে কেহ স্থায়ী বাসা বাঁধিতে পারে নাই। যাহাদের কথা সাহিত্যে বারে বারে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার তখন আইডিয়া মাত্র। ইহাতেই ছিল কবির মুক্তি, ইহাই ছিল কবির সাধনা।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বিবেকানন্দ করেন বেলুড় মঠ। দুটি প্রতিষ্ঠানেও আছে মূলগত পার্থক্য। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় তপোবন ও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মিলন। কিন্তু এই তপোবন যতটা যাজ্ঞবল্ক্য বা ভরদ্বাজ মুনির ছায়ায়, তার চেয়ে বেশি কবি কালিদাসের কল্পনায়। কালিদাসের তপোবন আর উপনিষদের আরণ্যক আশ্রমের মিশ্রণে প্রতিষ্ঠা হয় এই আশ্রম। অন্যদিকে বেলুড় মঠ হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকর্মসমন্বিত সাধনপ্রণালী গ্রহণ করে বেদান্তের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেলুড় হল ধর্মসমন্বয়ের কেন্দ্র, কর্মীরা হলেন সন্ন্যাসী। বেলুড় মঠ আজও এই রকম আছে। কিন্তু যেহেতু রবীন্দ্রনাথ কোন গণ্ডিবদ্ধ ধর্মমতে আবদ্ধ থাকতে পারতেন না, সেহেতু তাঁর জীবদ্দশাতে তাঁর আশ্রমও একই সঙ্গে পরিবর্তনের পথে এগিয়ে গিয়েছে।

রূপস্রষ্টা কবি ও ধর্মগুরু সন্ন্যাসীর কর্মজীবন তাই দ্বিধারায় প্রবাহিত। চিন্তায় সামঞ্জস্য সত্বেও, বক্তব্যে সাদৃশ্য সত্বেও দু'জনে কাছাকাছি আসতে পারেন নি। শুধু সম্পর্কের আদিতে তাঁদের একসূত্রে বেঁধেছিল সংগীত, অন্তে বাঁধে বিজ্ঞান। আপাতদৃষ্টিতে কবি বা সন্ন্যাসী কারো সঙ্গেই বিজ্ঞানের সম্পর্ক থাকার কথা নয়; কিন্তু দু'জনের চিন্তাধারায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রধান হয়ে উঠেছিল। সেই কারণেই তাঁদের বিশ্লেষণ এতো স্বচ্ছ, এতো আকর্ষক। তাছাড়া প্রাচ্যের গৌরবে গরীয়ান হয়েও ওই বিজ্ঞানের জন্যই দু'জনে পাশ্চাত্যের দিকে মুখ না ফেরাতে বারবার বলেছেন। শুধু তাই নয়, আমাদের ভারতবর্ষও যাতে বিজ্ঞানচর্চায় অগ্রণী হয়, সেদিকে আগ্রহ ছিল দু'জনের। তার প্রমাণ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ দু'জনেই জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং দু'জনেই চেয়েছিলেন বাঙালী বিজ্ঞানীর কীর্তি বিদেশে স্বীকৃত হোক। জগদীশচন্দ্রের যখন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দেখাতে বিলাত যাওয়ার কথা হয়, তাঁকে সর্বাধিক সাহায্য করেন বন্ধু রবীন্দ্রনাথ। জগদীশচন্দ্রকে বিদেশে পাঠানোর জন্যে তাঁর কী আকুলতা। নিজে অগ্রসর হয়ে ত্রিপুরার মহারাজার কাছ থেকে জাহাজ-ভাড়ার টাকা সংগ্রহ করেন এবং কলকাতার ঘাটে বিজ্ঞানীবন্ধুকে জাহাজ তুলে দিয়ে আশ্বস্ত বোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ এক প্রান্তে যাঁকে তুলে দিলেন বিদেশের পথে, অন্য প্রান্তে তাঁকে তুলে নিলেন বিবেকানন্দ। কবির হাত থেকে সন্ন্যাসীর হাতে গেলেন বিজ্ঞানী। প্যারিস প্রদর্শনীতে যে সভায় জগদীশচন্দ্র তাঁর বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ দেখান, সেখানে সূচনা ভাষণ দেন বিবেকানন্দ।

কিন্তু সব শেষে সেই আগের কথাই টিঁকে থাকে। উৎস আর মোহানার ক্ষেত্র এক হলেও কবির পদ্মা আর সন্ন্যাসীর গঙ্গা খানিক দূর এক সঙ্গে এগিয়ে দুই খাতে বয়ে গিয়েছে। দু'জনের চিন্তায় অজস্র মিল, কিন্তু দু'জন দুই পথের পথিক। মনের দিক থেকে যত

কাছাকাছি থাকুনই না কেন, জীবনচর্যায় দু'জন দুই মেরুতে। ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ হয়ে দু'জনেই জয়গান গেয়েছেন মানুষের। কিন্তু দু'ভাবে। আর এই দু'জনকে পাশাপাশি রেখেই আমাদের ইতিহাস গৌরবময়। বিরোধ নেই, বিদ্বেষ নেই, সমান্তরাল দুর্বার গতি নিয়ে দু'জনে সাগরমুখী। দু'জনেই দুরকম ভাবে আমাদের বলেছেন—

দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধ
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যর পদে
মানব মর্যাদা-বিসর্জন,
নিষ্ঠুর আঘাতে নিঃসংকোচে।

কিন্তু হায়, আজো আমরা না পারলাম নিঃসংকোচ হতে, না পারলাম নিষ্ঠুর আঘাত হানতে। শুধু দুই সমসাময়িক মহাপুরুষের পূজা করেই কর্তব্য সারলাম। চিত্তের দাসত্ব দূর করার উদ্যোগ কোথায়?

মহাকবি ও মহাপ্রভু



এই বাংলাদেশে বহু মনীষীর জন্ম দিয়েছে। তাঁদের চিন্তা ও কর্ম আমাদের প্রেরণা দিয়েছে, উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁদের পরিচয়ে আমাদের পরিচয়। জয়দেব, চণ্ডিদাস, মধুসূদন সরস্বতী, রঘুনাথ শিরোমণি, অদ্বৈত মহাপ্রভু, শ্রীরূপ গোস্বামী থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর রামমোহন, মাইকেল, দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্পর্শে বাংলার মাটি পুণ্যবতী। বাঙালী জাতি সৃষ্টির গত এক হাজার বছরের ইতিহাসে কত প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ, কত লোকোত্তর প্রতিভা এই শ্যামল জনপদকে গৌরব-মণ্ডিত করেছেন। তাঁদের অকৃপণ দানেই আমরা, উত্তরসূরীয়া বাঙালী হিসাবে উন্নতশির। কিন্তু সব ছাপিয়ে সব ছাড়িয়ে দু'জন মহাপুরুষের নাম উজ্জ্বল। কীর্তিতে বা খ্যাতিতে অন্য কেউই ছোট নন, কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিভা হয়ত তুলনামূলক ভাবে বেশি ; তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ভাবপ্রবণ সংস্কৃতিবান, রুচিবান বাঙালী জাতি বলতে আজ যা বোঝায়, ভালো মন্দ মিলিয়ে সেই জাতির মানসগঠনে সর্বাধিক প্রভাব সেই দু'জনের, —পৌনে চারশ' বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও যাঁরা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। একজন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, অন্যজন মহাকবি রবীন্দ্রনাথ।

বাঙালী জাতির জীবনে ও মননে প্রভাবের বিচারে চৈতন্যদেব আবার রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বহু যোজন ঊর্ধ্বে। গত প্রায় পাঁচশো

বছর ধরে চৈতন্য মহাপ্রভু ধনী দরিদ্রের ঘরে, অভিজাত অবজ্ঞাতের হৃদয়ে, নগরে পল্লীতে সর্বব্যাপী হয়ে আছেন। আমাদের নিত্য-কর্মপদ্ধতিতে কিংবা কোন প্রকার ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে মহাপ্রভুর নাম বাঙালীর জিহ্বাগ্রে। মহাপ্রভুর কৃপাতেই রাধা এবং কৃষ্ণ আমাদের প্রাণের ঠাকুর। সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা রুচি জীবনযাপন ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও বহুবিস্তৃত, কিন্তু এখনো নগর ছাড়িয়ে পল্লীর জনপদে জনপদে তিনি তেমন পৌঁছননি। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও চিন্তাধারায় নগরবাসী বিপুলভাবে প্রভাবিত, যাঁরা মুখে রবীন্দ্রবিরোধী, তাঁরাও এই সর্বমুখী প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর প্রভাব দিন দিন বিস্তারিত হচ্ছে শিক্ষার আলো বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে। বাঙালী হিন্দুর বাড়িতে শ্রাদ্ধের দিনে অপরিহার্য কীর্তন গানের পাশে ধীরে ধীরে ঠাঁই নিচ্ছে রবীন্দ্রসংগীত। শোকের সময় চৈতন্যদেবের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথ। আনন্দের দিনেও দু'জনে পাশাপাশি। দোলের দিনে আমরা রাধাকৃষ্ণের গানের সঙ্গে গীতবিতানের ঋতুসংগীত মিলিয়ে দিচ্ছি। তবু রবীন্দ্রসংগীতের প্রভাব কীর্তনগানের সুবিশাল প্রভাবের তুলনায় নগণ্য। চৈতন্যদেব কলিযুগে কৃষ্ণ অবতার। তাঁর সঙ্গে কোন মানবের তুলনা চলে না। তবু লৌকিক এবং ঐতিহাসিক বিচারে ভাগবতীতনু রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যদেব থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা দ্বিতীয়। চৈতন্যদেবই প্রথম এবং আজো অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাঙালী, যিনি দীর্ঘকাল একটি জাতির ধর্ম-কর্ম-জীবন-মনন চৈতন্যময় করে রেখেছেন। তার পরেই স্থান রবীন্দ্রনাথের। চৈতন্যদেবের পরেই আমরা তাঁর কাছে ঋণী। রবীন্দ্রনাথের বাহন চৈতন্যদেবের মতো ভক্তিমার্গী ধর্ম নয়, তাঁর সৃষ্টি মূলত বুদ্ধিগ্রাহ্য, তবু আমাদের ভাবাবেগ, আমাদের সৌজন্যবোধ, সৌন্দর্যসম্ভোগে রুচি সাহিত্য সংগীত সংস্কৃতিতে আগ্রহ—সবই মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও মহকবি রবীন্দ্রনাথের দান।

' মহাপ্রভু আর মহাকবি। দুই মহাপুরুষের জীবনেও কী আশ্চর্য মিল। অপূর্ব দেহকান্তি নিয়ে গৌরাঙ্গ বিশ্বম্ভর জন্মগ্রহণ করেন সেকালের কলকাতা নবদ্বীপে। আর রবির আলোর মতো উজ্জ্বল রবীন্দ্রনাথের জন্ম একালের নবদ্বীপ কলকাতায়। দু'জনেরই আদি নিবাস বর্তমান বাংলাদেশে। চৈতন্যদেবের আয়ুষ্কাল ৪৮ বৎসর। তার অর্ধাংশ কেটেছে বাংলাদেশে। বাকি অর্ধাংশ অন্যত্র। ২৪ বছর বয়সে তিনি নবদ্বীপ ছেড়ে পুরী শ্রীক্ষেত্রকে নতুন কর্মক্ষেত্র করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ বেঁচেছেন আশী বছর। তিনিও জীবনের ঠিক অর্ধাংশ কলকাতায় কাটিয়ে ঠিক ৪০ বছর বয়সে নতুন কর্মযজ্ঞ শুরু করেন শান্তিনিকেতনে। চৈতন্যদেব নিজে সাহিত্যস্রষ্টা না হয়েও বাংলা সাহিত্যে নতুন জোয়ার আনেন তাঁর মহিমান্বিত প্রভাবে। তাঁর জীবন অবলম্বন করে গড়ে ওঠে বিশাল জীবনী সাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলী পায় নূতন প্রেরণা। তাঁর আবির্ভাবের পরেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে গৌরবের সূচনা। ঐশ্বর্যবান বাংলা সাহিত্য সম্ভারের গৌরচন্দ্রিকা সেই সুসময়েই। রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় 'চৈতন্য বঙ্গভাষায় তাঁহার প্রেমাবেগ সর্বসাধারণের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন।'

বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় যৌবন রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পরে। তিনি নিজে স্রষ্টা, তাছাড়া তাঁকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্যের সৌরজগৎ। সেকালের বাংলা সাহিত্য যেমন চৈতন্যদেবের প্রেম-ভক্তিরসে আপ্লুত, একালের বাংলা সাহিত্য তেমনি রবিকরোজ্জ্বল। সাহিত্যের পর সংগীত। চৈতন্যদেব আর রবীন্দ্রনাথ আমাদের উপহার দিয়েছেন দু'টি সম্পদ—কীর্তন আর রবীন্দ্রসংগীত। বাঙালী জাতির সবচেয়ে গর্ব এই দুটি জিনিস নিয়ে। দুটিই বাংলার প্রাণ। তাছাড়া দু'জনেই উপলব্ধি করেছিলেন, সংগীত যেখানে নিঃশেষ, সেখানেই শুরু নৃত্যের। ভাষাহীন সুরহীন নৃত্য-ছন্দ স্বর্গের সুষমা আনে। দু'জনেই যেন বলেছেন 'নৃত্যরসে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে'।

তাই বারবার দেখি মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম করতে করতে ভাবাবেশে নৃত্য শুরু করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথও অন্ধ বাউল বা ঠাকুরদার ভূমিকায় নেমে গানের সুরের সঙ্গে মঞ্চে হঠাৎ নৃত্যের ছন্দ তোলেন। নাচকে এমন মর্যাদা চৈতন্যদেব আর রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ দেননি।

চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামেন পতিত উদ্ধারিতে, নামগান প্রচার করেন সবার অধম সবহারাদের মাঝে। রবীন্দ্রনাথও জন্মগত ভাবে উপবীতধারী ব্রাহ্মণ, তবু অনায়াসে ঘোষণা করেন, 'আমি ব্রাত্য আমি মন্ত্রহীন'। দু'জনেই মধুর রসের পথিক, কিন্তু বলিষ্ঠ মতের প্রচারক। দু'জনেই ছিলেন দীর্ঘদেহী গৌরাঙ্গ। দু'জন দুই পথের পথিক হয়েও দুইভাবে বিপ্লবী। এই বিপ্লব প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী না হয়েও সুদূরপ্রসারী। আনন্দময় উৎসবকে দু'জনেই প্রাধান্য দিয়েছেন জীবনে। তার মধ্যে বসন্তঋতুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দু'জনের। একজন বলেন দোললীলা, অন্যজন বলেন বসন্তোৎসব। দু'জনেরই যিনি উপাস্য, তাঁর বর্ণ শ্যামল। একজনের শ্যামল কৃষ্ণ, অন্যজনের শ্যামল প্রকৃতি।

চৈতন্যদেব তবু শীর্ষে। তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব এবং লৌকিক জীবনে তাঁর অলৌকিক মহিমা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেও শ্রদ্ধাবান ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যজীবন এবং তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল রবীন্দ্রনাথকে। অনেকের ধারণা, রবীন্দ্রনাথের ধ্যানধারণা যেন শুধু উপনিষদকেন্দ্রিক। উপনিষদ নিশ্চয়ই তাঁর প্রেরণার অন্যতম উৎস, কিন্তু বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্য যে তাঁকে কতটা প্রেরণা দিয়েছিল, সেই সম্পর্কে অনেকেই অবহিত নন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, উপনিষদ আর বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি তাঁর ঋণের কথা। ১৯২১ সালে বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'বৈষ্ণব সাহিত্য ও উপনিষদ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি করিয়াছে। নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন যেমন মেশে, তেমনি করিয়াই মিশিয়াছে।'

শ্রীচৈতন্যের জীবনের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের পরিচয় সেই বাল্যকাল থেকে। বিভিন্ন সময়ে তিনি চৈতন্যদেবের জীবনী পরম আগ্রহে বারবার পড়েছেন। ১৯১০ সালে লেখা একটি চিঠিতে বলছেন, 'বৈষ্ণবকাব্য এবং চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি কাব্য অবলম্বন করে চৈতন্যের জীবনী আমি অনেক বয়স পর্যন্ত বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করেছি।' ১৯৩৬ সালে হেমন্তবালা দেবীকে আর একখানা চিঠিতে লিখেছেন—'প্রথম বয়সে বৈষ্ণব সাহিত্যে আমি ছিলুম নিমগ্ন। চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত পড়েছি বারবার। পদকর্তাদের সঙ্গে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়।' তাই আমরা দেখতে পাই প্রেমিক চৈতন্য, বিপ্লবী চৈতন্য, মানবদরদী চৈতন্য এবং বাঙালী জাতির ভাষার ও সাহিত্যের উদ্বোধক চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি রবীন্দ্রনাথ এতো শ্রদ্ধাশীল।

রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যদেবকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন; প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; আইন অমান্য আন্দোলন, বিক্ষোভ মিছিলের সংগঠন, আপামর জনসাধারণকে পরম স্নেহে বুকে তুলে নেওয়া, প্রেমধর্মের প্রচার ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করে ছিল। তাঁর রচনাবলীতে মহাপ্রভু সম্পর্কে মহাকবি লিখছেন—'আমাদের বাঙালীর মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তো বিঘা কাঠার মধ্যে বাস করিতেন না। তিনি সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন তো বাংলা পৃথিবীর এক প্রান্তভাগে ছিল, তখন সাম্য ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি কথাগুলোর সৃষ্টি হয় নাই। সকলেই আপনাপন আহ্নিক তর্পণ ও চণ্ডীমণ্ডপটি লইয়াছিল—তখন এমন কথা কেমন করিয়া বাহির হইল—'মার খেয়েছি। না হয় আরো খাব তাই বলে কি প্রেম দিব না? আয়।'—একথা ব্যাপ্ত হইল কী করিয়া? সকলের মুখ দিয়া বাহির হইল কী করিয়া? আপনাপন বাঁশ বাগানের পার্শ্বস্থ ভদ্রাসন বাটির মনসা-

সিজের বেড়া ডিঙাইয়া পৃথিবীর মাঝখানে আসিতে কে আহ্বান করিল, এবং সে আহ্বানে সকলে সাড়া দিল কী করিয়া? একদিন তো বাংলাদেশে ইহাও সম্ভব হইয়াছিল? একজন বাঙালী আসিয়া একদিন বাংলাদেশকেও পথে বাহির করিয়াছিল। একজন বাঙালী একদিন সমস্ত পৃথিবীকে পাগল করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং বাঙালীরা সেই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিল। বাংলার সে এক গৌরবের দিন। তখন বাংলা স্বাধীনই থাকুক আর অধীনই থাকুক আর স্বদেশীয় রাজার হাতেই থাকুক তাহার পক্ষে সে একই কথা। সে আপন তেজে আপনি তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।'

চৈতন্যদেবের সংগ্রাম ছিল সবরকম ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে। তাঁর অস্ত্র ছিল প্রেমধর্ম। ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম রাজশক্তির বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন শুরু করেন। কাজীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল আইন অমান্যের প্রথম নিদর্শন। রাজধর্ম ইসলামের অপ্রতিরোধ্য শক্তি প্রথম বাধা পায় তাঁর হাতে। সাম্য ও ভক্তির মিশ্রণে গঠিত তাঁর প্রেমধর্ম হরিনাম সংকীর্তনের সম্মোহনী শক্তিতে আকৃষ্ট করেছিল সর্বশ্রেণীর, বিশেষ করে পতিত অবহেলিত সমাজের লোকদের। এই বলিষ্ঠ অথচ প্রেমময় ভাববন্যার বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আসল কথা, বাংলায় সেই একদিন সমস্ত একাকার হইবার জো হইয়াছিল। তাই কতকগুলো লোক খেপিয়া চৈতন্যকে কলসির কানা ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। কলসির কানা ভাসিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে এমনি একাকার হইল যে, জাতি রহিল না, কুল রহিল না, হিন্দু মুসলমানেও প্রভেদ রহিল না। তখন তো আর্যকুলতিলকেরা জাতিভেদ লইয়া তর্ক তুলে নাই। আমি বলি, তর্ক করিলেই তর্ক উঠে। বৃহৎভাব যখন অগ্রসর হইতে থাকে, তখন তর্কবিতর্ক খুঁটিনাটি সমস্তই অচিরাৎ আপনাপন গর্তের মধ্যে সুড়সুড় করিয়া প্রবেশ করে। কারণ মরার বাড়া আর গাল নাই। বৃহৎ ভাব আসিয়া বলে, সুবিধা অসুবিধার কথা হইতেছে

না, আমার জন্য সকলকে মরিতে হইবে। লোকেও তাহার আদেশ শুনিয়া মরিতে বসে। মরিবার সময় খুঁটিনাটি লইয়া তর্ক কে করে বল।'

প্রেমধর্মের আদর্শনিষ্ঠা এবং তাঁর বহুমুখী আবেদন রবীন্দ্রনাথকে সারা জীবন মুগ্ধ রেখেছিল। 'সমূহ' গ্রন্থের 'দেশহিত' প্রবন্ধে বাংলা-দেশের স্বদেশিকতার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি চৈতন্যদেবের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন, 'চৈতন্যদেব একদিন বাংলাদেশে প্রেমের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কাম জিনিসটা অতি সহজেই প্রেমেব ছদ্মবেশ ধরিয়া দলে ভিড়িয়া পড়ে, এইজন্য চৈতন্য যে কিরূপ একান্ত সতর্ক ছিলেন, তাহা তাঁহার অনুগত শিষ্য হরিদাসের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহারে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় চৈতন্যের মনে যে প্রেমধর্মের আদর্শ ছিল, তাহা কত উচ্চ, তাহা কিরূপ নিষ্কলঙ্ক। তাহার কোথাও লেশমাত্র কালিমাপাতের আশংকায় তাহাকে কিরূপ অসহিষ্ণু ও কঠিন করিয়াছিল। নিজের দলের লোকের প্রতি দুর্বল মমতাকে তিনি মনে স্থান দেন নাই—ধর্মের উজ্জ্বলতাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার প্রতিই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

চৈতন্যদেব বাঙালী জাতিকে সংযুক্ত করেছিলেন বিশ্বচেতনার সঙ্গে। অখণ্ড ভারতবোধ জাগ্রত করার পশ্চাতেও তাঁর দান অনেক। তিনি দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারতকে যুক্ত করেছিলেন পূর্ব-ভারতের সঙ্গে। কোন রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে নয়, প্রেমধর্মের মাধ্যমে। সাম্য, মৈত্রী ও ভালবাসা ছিল তাঁর প্রেমধর্মের মূলমন্ত্র। আর একটি মন্ত্র ছিল তাঁর। নামসংকীর্তন। সমবেত কণ্ঠে সংগীতের ধ্বনিতে ভগবদ্ উপাসনার এমন দৃষ্টান্ত অভূতপূর্ব। রবীন্দ্রনাথ তাই লেখেন —'চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাংলাদেশের গানের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এক কণ্ঠবিহারী বৈঠকী সুরগুলো কোথায় ভাসিয়া গেল? তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গহিল্লোল সহস্র

কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগরাগিণী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, একজনকে ছাড়িয়া সহস্রজনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বলিয়া এক নূতন কীর্তন উঠিল। যেমন ভাব, তেমনি তাহার কণ্ঠস্বর —অশ্রুজলে ভাসাইয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য ক্রন্দনধ্বনি।'

রবীন্দ্রনাথ ভারত ইতিহাসের তিনজনকে সর্বাধিক শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁর রচনাবলীতে। বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব ও রামমোহন। বুদ্ধদেবকে তিনি বলেছেন 'নরোত্তম'। চৈতন্যদেবের মলবাণী তাঁকে শ্রদ্ধাবনত করেছিল। মুক্তবুদ্ধির জন্য রামমোহনও তার কাছে ছিলেন প্রণম্য। শান্তিনিকেতনের মন্দিরে উপাসনায় আচার্যের ভাষণে তিনি এই তিনজনের কথা উল্লেখ করেছেন বারবার। ১৯১১ সালের ১৪ মার্চ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে একটি ভাষণ দেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৬ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেন 'একদিন চৈতন্য আমাদের বৈষ্ণব করেছিলেন। সেই বৈষ্ণবের জাত নেই কূল নেই। আর একদিন রামমোহন রায় আমাদের ব্রহ্মলোকে উদ্বোধিত করেছেন। সেই ব্রহ্মলোকেও জাত নেই দেশ নেই।'

হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতিয়েছিলেন মহাপ্রভু।' তিনি বলেছিলেন 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ। হরিভক্তির মাধ্যমে তিনি বাঙালীর মনে জাগিয়েছিলেন ভারতবোধ। এই আচারের শাসন থেকে মুক্ত একটি আনন্দময় সমাজের জয়গান বরাবর গেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সঙ্গে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের প্রেমময় সম্পর্কের কথাও তিনি উচ্চারণ করেছেন তাঁর কবিতায় ও গানে। এই আনন্দময় সমাজ ও প্রেমময় ভগবদভক্তির উদগাতা স্বয়ং চৈতন্যদেব। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সংগীত-সৃষ্টিতে চৈতন্যদেবের জীবন ও দর্শন প্রভাব বিস্তার করেছে এতো বিপুল আকারে, এতো গভীর আবেগে।

বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছোটবেলা থেকেই। বয়স যখন বারো তেরো, তখন থেকেই পদাবলী তাঁর প্রাণ। সেই কারণেই অলস অন্যমনে কিশোর কবি হঠাৎ লিখে ফেলেন, 'গহনকুসুম কুঞ্জমাঝে'। সেই হঠাৎ রচনা থেকেই সৃষ্টি ভানুসিংহের পদাবলী। বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাসের কবিতা তিনি এমন আত্মস্থ করেছিলেন যে, অনায়াসে ব্রজবুলির মধুর পদ উৎসারিত হয়েছে তাঁর কলম থেকে। যে-ছুটি বৈষ্ণব পদে তিনি সুর দিয়েছেন, তাও বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাসের। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর এবং সুন্দর রাধে আওয়ে বনি। এ দুটি গান তিনি সব সময় গাইতেন। গাইতেন আরো অনেক পদও। জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাসের কবিতা ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। জ্ঞানদাসের 'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন' পদটি সাহিত্য আলোচনায় বহুবার দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করেছেন। শুধু তাই নয়, তার অনুকরণে সোনার তরীর 'বর্ষাযাপন' এবং সানাই গ্রন্থের 'মানসী' কবিতাটিও লিখেছেন। বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পর্কে তার ব্যাখ্যা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচনা। তিনি লেখেন—'বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি।'

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীতে এতো মগ্ন ছিলেন যে, তাঁর যৌবনেই পদরত্নাবলী সংকলন করেছিলেন। ছিন্নপত্রাবলী বা অন্যান্য চিঠিপত্র পড়লে জানা যায় বৈষ্ণবপদাবলী, চৈতন্যজীবনী ও কীর্তনগানের জন্যে তাঁর কী আগ্রহ। একটি চিঠিতে লিখেছেন—'প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণবকবির ছন্দোঝংকার এনে দেয়। তার প্রধান, কারণ, এই সমস্ত সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়।

এই সৌন্দর্যের মধ্যে বৈষ্ণবকবিদের সেই অনন্ত-বৃন্দাবন রয়ে গেছে। বৈষ্ণব কবিতায় যথার্থ মর্মের ভিতরে যে প্রবেশ করেছে, সে সমস্ত প্রকৃতির ভিতর সেই বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।' শিলাইদহ থেকে আর একখানা চিঠিতে দুঃখ করে বলছেন—'বরাবর বৈষ্ণব কবি ও সংস্কৃত বই আনি। এবার আনিনি। সেইজন্যে, ঐ দুটোর আবশ্যক বেশি অনুভব হচ্ছে।'

হেমন্তবালা দেবীকে লেখা আর একখানা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আরো স্পষ্ট—'প্রথম বয়সে বৈষ্ণব সাহিত্যে আমি ছিলুম নিমগ্ন, সেটা যৌবনচাঞ্চল্যের আন্দোলনবশত নয়, কিছু উত্তেজনা ছিল না এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু ওর আন্তরিক রসমাধুর্যের গভীরতায় আমি প্রবেশ করেছি। চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যভাগবত পড়েছি বারবার। পদকর্তাদের সঙ্গে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অসীমের আনন্দ এবং আহ্বান যে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানবপ্রকৃতির বিচিত্র মধুরতায় আমাদের অন্তরবাসিনী রাধিকাকে কুলত্যাগিনী করে উতলা করেছে প্রতিনিয়ত, তার তত্ত্ব আমাকে বিস্মিত করেছে। কিন্তু আমার কাছে এই তত্ত্ব ছিল নিখিল দেশকালের—কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ পাত্রে কতকগুলি বিশেষ আখ্যায়িকায় আবদ্ধ করে একে আমি সংকীর্ণ অবিশ্বাস্য করে তুলতে পারিনি।'

পঞ্চভূত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ধর্মের একটা ব্যাখ্যাও করেছেন, বলেছেন, 'বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে।' ভক্ত আর ভগবানের মধ্যে প্রেমের সম্পর্কই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মনের কথা। রবীন্দ্রনাথ আর একটু এগিয়ে গিয়ে বলেছেন—

সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে
কবির চোখের কাছে
কোন একটি মেয়ে ছিল,
ভালোবাসার কুঁড়িধরা তার মন।

মুখচোরা সেই মেয়ে,
চোখে কাজলপরা,
ঘাটের থেকে নীল শাড়ি
নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা।
(শ্যামলী, স্বপ্ন)

সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের বৈষ্ণব কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ওই একই কথা আরো স্পষ্ট করে বলেছেন—

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে। প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই
তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।

শুধু ধর্মের ব্যখ্যা নয়, বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব ভাষা ইত্যাদি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন আলোচনা করেছেন। গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতির নাম তাঁর কবিতার পঙক্তিতে প্রবেশ করেছে অনেকবার। বর্ষা প্রেম প্রীতি ইত্যাদি প্রসঙ্গ এলেই বৈষ্ণবপদকর্তারা রবীন্দ্রনাথের প্রধান দৃষ্টান্তস্থল হয়েছেন। তাঁর নিজের লেখা গানে তো বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রভাব অজস্র। সখি ওই বুঝি বাঁশি বাজে, ওগো শুন কে বাজায়, এখনো তারে চোখে দেখিনি, বুঝি বেলা বয়ে যায়—উদাহরণ অসংখ্য। আর কীর্তন গান তো ছেয়ে আছে রবীন্দ্র সংগীতের আকাশ। আর কোন সংগীত এতো প্রভাব বিস্তার করেনি রবীন্দ্রনাথের জীবনে। কীর্তনগানের ভাব নাটকীয়তা এবং কথার গুরুত্ব রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য হয়েছে পরে। সোজাসুজি কীর্তন ভেঙে তিনি যেমন অনেক গান রচনা করেছেন, তেমনি কীর্তনের ছায়ায় রচিত অনেক রবীন্দ্রসংগীত। ওহে জীবনবল্লভ, আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি, আমার মন মানে না দিন রজনী, সে আমার গোপন কথা, রোদনভরা এ বসন্ত ইত্যাদি। এগুলিকে বলা হয়

রবি-কীর্তন। কীর্তনগান সম্পর্কে ১৯৩৬ সালে দিলীপকুমার রায়কে এক চিঠিতে বলেছেন—

কীর্তনসংগীত আমি অনেককাল থেকেই ভালোবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে, সে আর কোনো সংগীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানিনে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তারই মধ্যে ওর শিকড়, কিন্তু ও শাখায় প্রশাখায় ফলেফুলে পল্লবে সংগীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে। কীর্তনসংগীতে বাঙালীর এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি।

কীর্তনগান ভালো লাগার আর একটি কারণ আবিষ্কার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছেন—কীর্তনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সেটাও ঐতিহাসিক কারণেই। বাংলায় একদিন বৈষ্ণব-ভাবের প্রাবল্যে ধর্মসাধনায় বা ধর্মরসভোগে একটা ডেমোক্রেসির যুগ এল। সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগ সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল। সে প্রকাশ সভার আসরে নয়, রাস্তায় ঘাটে। বাংলার কীর্তনে সেই জন সাধারণের ভাবোচ্ছ্বাস গলায় মেলাবার খুব একটা প্রশস্ত জায়গা হল।

রবীন্দ্রনাথ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের রসে এমন মজেছিলেন যে, তার পরকীয়াতত্ত্বের স্বরূপ নিয়ে পর্যন্ত আলোচনা করেছেন। প্রেমের বৈশিষ্ট্য বিচার প্রসঙ্গে তিনি দিলীপকুমার রায়কে এক চিঠিতে (তীর্থঙ্কর) বলছেন—পরকীয়া সাধনের তত্ত্বটা মিথ্যে নয়। তার মানেই হচ্ছে পরকীয়া নারী আমার বাধ্য নয় বলেই আমার পরে তার শক্তি এত প্রবল, তার প্রেমের এত মূল্য। এইজন্যে বিবাহ যখন বর্বর যুগে স্থূল শাসনের থেকে মুক্তি পাবে, তখন সকল বিবাহেই পরকীয়া সাধন প্রচলিত হবে। তখন স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য আছে বলেই তার মূল্য পুরুষের কাছে বেশি হবে। বিবাহে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এই পরকীয়া সাধনের যুগ এসেছে বলেই আশা করি।

লোকসাহিত্য গ্রন্থে পরকীয়া তত্ত্ব নিয়ে কবির বক্তব্য এই রকম—'বৈষ্ণব কাব্যশাস্ত্রে পরকীয়া অনুরক্তির বিশেষ গৌরব বর্ণিত হইয়াছে সে গৌরব সমাজনীতির হিসাবে নহে, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাহা নিছক প্রেমের হিসাবে। ইহাতে যে আত্মবিস্ময়, বিশ্ববিস্মৃতি নিন্দা ভয় লজ্জা শাসন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, কঠিন কুলাচার লোকাচারের প্রতি অচেতনতা প্রকাশ প্রায় তদ্দ্বারা প্রেমের প্রচণ্ড বল, দুর্বোধ রহস্য তাহার বন্ধনহীনতা সমাজসংসার স্থান-কাল-পাত্র এবং যুক্তিতর্ক কার্যকারণের অতীত একটা বিরাট ভাব পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। এই কারণে যাহা বিশ্বসমাজে সর্বত্রই এক বাক্যে নিন্দিত, সেই অভ্রভেদী কলঙ্কচূড়ার উপরে বৈষ্ণবকবিগণ তাঁহাদের বর্ণিত প্রেমকে স্থাপন করিয়া তাহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন।

এ তো গেল পরকীয়াতত্ত্বের দিক। কিন্তু এটাই সব নয়, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ধর্মের ভিতর পেয়েছিলেন সর্বজনীন মহান সত্য। তাই 'সাধনা' গ্রন্থে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ

The Vaishnava relgion has boldly declared that god has bound himself to love and in that consist the greatest glory of human existence'.

তাই রবীন্দ্রনাথ কাব্যে জানান, 'যারে বলি ভালোবাসা, তারে বলি পূজা' এবং বৈষ্ণবধর্মের উদারতার মন্ত্রে দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসে গোরার মুখ দিয়ে বলেন—আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে ভালোবাসা যেমন মানুষে মানুষে, তেমনি ভগবানে এবং মানুষেও। বৈষ্ণবদের মতে ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ। তিনি আনন্দময় ভগবানরূপে ভক্তের সঙ্গে লীলা করতে ভালোবাসেন।

ভক্ত যেমন ভগবানকে চায়, তেমনি লীলারস আস্বাদনের জন্যে ভগবানেরও প্রয়োজন ভক্তকে। এই তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি গানের দুটি পংক্তিতে নিবেদন করেছেন সরলতম ভাষায়। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছ নিচে
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে'—

তখন মনে হয় 'রাধিকার ভাবমূর্তি' যে মহাপ্রভুর অন্তর, সেই ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব যেন মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মুখ দিয়েই কথাগুলি বলিয়ে নিয়েছেন। কলিযুগের গৌরাঙ্গরূপী অবতার—যিনি কৃষ্ণ এবং রাধিকার যুগল আধার, তাঁর চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন 'মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।'

সেই ইচ্ছারই বিকাশে গৌরাঙ্গ অবতারের আবির্ভাবের কথা ভক্ত বৈষ্ণবের মতো তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। তিনি ঘোষণা করেন—

'তাইতো প্রভু, যেথায় এলে নেমে
তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে
মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।

মহাপ্রভুর চরণে মহাকবির এই প্রণামে দেবলোক ও নরলোক, ভক্ত ও ভগবান, সেকাল ও একাল বাঁধা পড়ে গেছে। বন্ধনীতে এসে গেছে নবদ্বীপ ও শান্তিনিকেতন। দুই বিপরীত কোটির জগৎ হয়েও প্রেমের জোয়ারে সব একাকার।

হিসাবের আড়ালে



হিসাবের আড়ালে চাপা পড়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনে। রবীন্দ্র জীবনের নানা উপকরণ এখন গুছিয়ে গাছিয়ে যত্নে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে ওখানে। খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ পাওয়া গেছে ঠাকুরবাড়ির হিসাবের খাতা। মহর্ষির আমল থেকে তাঁর নাতি রথীন্দ্রনাথ অবধি। খাতার পর খাতা। পাহাড় প্রমাণ। সব খাতায় আছে ঠাকুর-পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের পাই পয়সার হিসাব। খাজাঞ্চিদের লেখা, কিন্তু পাতায় পাতায় সই দেবেন্দ্রনাথের বা রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ সই করেছেন আর টি ইংরেজি আদ্যক্ষর দিয়ে। এই হিসাবের খাতার মধ্যেই বন্দী হয়ে আছে অনেক ঘটনা, অনেক তথ্য। তার বেশির ভাগই নতুন। দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, সৌদামিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ, মৃণালিনী দেবী, রথীন্দ্রনাথ, মাধুরীলতা শমীন্দ্রনাথ—সবাই রয়েছেন খাতার পাতার আড়ালে।

যেহেতু আমার আগ্রহ রবীন্দ্রনাথে, তাই খাতার পাহাড় থেকে মাত্র কয়েকখানি নাড়াচাড়া করেই বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি, যা রবীন্দ্রজীবনীকারদের কাজে লাগবে। তথ্যগুলি পর পর সাজালে বেরিয়ে আসবেন নতুন এক রবীন্দ্রনাথ। শৈশব থেকে বার্ধক্য—নানা সময়ের নানা ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে ওই হিসাবের মধ্যে।

জমাখরচ মারফৎ শিশু রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বড় হয়েছেন, তার জামাকাপড়ের জুতোর মাপ পালটেছে, পড়ার বই পালটেছে তিনি যুবক হয়েছেন, বিয়ে করেছেন, পুত্র কন্যার পিতা হয়েছেন যৌবন ছাড়িয়ে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছেন এবং অবশেষে বৃদ্ধ হয়ে মহা-প্রয়াণ করেছেন। তিন বছরের শিশু রবীন্দ্রনাথের জন্যে কেনা হয়েছে বারো আনায় এক ডজন ইজের। সেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম যুবক হয়ে কিনলেন জোব্বা এবং পাগড়ি। তার দাম পড়ল সাড়ে তিন টাকা। সবই তারিখ দিয়ে লেখা।

রবীন্দ্রনাথ কোন্ সময়ে কী বই কিনেছেন, কলকাতায় থাকাকালে কবে কার বাড়িতে গিয়েছেন তার সাক্ষ্যও বহন করছে ওই খাতাগুলো। তার কারণ বইয়েব দাম বা যাতায়াত বাবদ ভাড়া গোমস্তাদের ক্যাশ বইয়ে লিখে রাখতে হয়েছে। কোন্ দরজি তাঁদের জামা-কাপড় বানাত, বই কেনা হত কোন্ দোকানে, গয়না আসত কোথা থেকে, কার অসুখে কোন্ ডাক্তার এসেছেন, কত ফি নিয়েছেন—কিছুই বাদ যায় নি খাতা থেকে। খাস চাকর কার কে ছিল, রবীন্দ্রনাথের কোন্ বই কত বিক্রি হয়েছে, জামাই ষষ্ঠীতে কত টাকা খরচ করেছেন, স্ত্রীর শ্রাদ্ধে ব্যয়ের পরিমাণ কত—অসংখ্য তথ্যে বোঝাই ওই খাতার পাহাড়।

তাছাড়া আর একটি ব্যাপারেও খাতাগুলি মূল্যবান। আজ থেকে প্রায় একশ' বছর আগে কোন্ জিনিসের কী দাম ছিল, রেলের ভাড়া ট্রামের ভাড়া, ঘোড়া গাড়ির ভাড়া কী রকম ছিল তার নির্ভুল বিবরণও পাওয়া যায় ওই খাতাতে। শুধু রবীন্দ্র জীবনের ইতিহাস নয়, সেকালের বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসও খানিকটা মেলে হিসাব থেকে।

সবচেয়ে পুরনো যে খাতা আমি উদ্ধার করতে পেরেছি, সেটি ১২৭১ বাংলা সনের। অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৬৪-৬৫ সালের। খাতাখানা দেবেন্দ্রনাথের। উপরে লেখা 'নিজ হিসাবের কেস বহি।' আকার

দৈনিক খবরের কাগজের মতো। বিশ্বভারতীর দেওয়া নম্বর ২৫১। এই খাতা থেকে জানা যায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রতি মাসে দশ টাকা করে পেতেন (বিজয় কিসন গোস্বামী ১০ টাকা), শান্তিনিকেতন খাতে যেত মাসে ১৩০ টাকা এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার খাতে দশ টাকা।

১২৭১ সালের ১৫ জ্যৈষ্ঠের হিসাবে মহর্ষি-কন্যা 'সুকুমারী-সুন্দরীর নবকুমার হওয়ায় বাটী হইতে আশীর্বাদ বাবদ যোল টাকা,' এবং শ্রীমতী সুকুমারী সুন্দরীর নবকুমার হওয়ার সংবাদ দেওয়া লোকের বকশিস দশ টাকা। ওই তারিখেই রবীন্দ্রনাথের মা সারদা দেবী অসুস্থ হওয়ায় বাড়িতে ডাক্তার আনা হয়। '—শ্রীমতী কর্ত্রী ঠাকুরাণীর পীড়া হওয়ায় নিলমাধব ডাক্তারকে আনা ও তাঁহার ফিচ —৪ টাকা।'

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী সেকালের নামকরা গাইয়ে, নামকরা সংগীতকার। তিনি মাসে পঞ্চাশ টাকা বেতন পেতেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে। '—অজুধ্যানাথ পাকড়াশির সন হালের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাহার মাহিয়ানা—১০০ টাকা।' আর যাঁরা যাঁরা কাজ করতেন নায়েব থেকে ফরাস—কে কী পেতেন তাও জানা যায় খাতা থেকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতিতে' শ্যাম নামক এক চাকরের কথা লিখেছেন। সে ছিল তার নিজস্ব এবং সারা দিনমানের সঙ্গী। কিন্তু তারও আগে যে আরও একজন খাস চাকর ছিল, তার উল্লেখ অন্যত্র কোথাও নেই। ওই হিসাবের খাতাতেই দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন তিন, তখন তিনি ও তাঁর দাদা সোমেন্দ্র-নাথের জন্যে আলাদা একজন চাকর বরাদ্দ ছিল—যার নাম কালী দাস। তার মাসে মাহিনা সাড়ে তিন টাকা। তখন বাড়ির নাপিত ছিল বংশী—মাসে পেত তিন টাকা, দরজির নাম মোজাফফর খলিফা —মাসে পেত আড়াই টাকা। তাছাড়া জনে জনে চাকর ছাড়াও ছিল তোসাখানার চাকর ঈশ্বর দাস, বোলাকি হরকরা, কিষ্ণু সিং

হরকরা, কেবল জানকি তুলসি বেহারা, বাটির মধ্যে জল তোলা ভারী, লালদীঘির ও গোয়ালের জল তোলা ভারী, রসুই ঘরের চাকর, দুধের ঘরের চাকর, বাগানের মালী, বলবন্ত সিং দারোয়ান, মদন সিং দারোয়ান, বাদল ফরাস, বেণী ফরাস, ঝকড়ু বেহারা, এবং হারমোনিয়াম বাজানোর চাকর গোপাল দাস—প্রতি মাসে যার বেতন দু' টাকা।

নাপতিনী আসত বাড়ির মেয়েদের পায়ে আলতা পরাতে। মাসে নয়, গোটা বছরে সে পেত দুই টাকা। ধোপার নাম কাশীনাথ—মাস মাহিনা ২০ টাকা। মহম্মদ কোচম্যান, রহমৎ সহিস, শ্রীধর মেথর—কত লোক। সেই সঙ্গে গাইয়ে বিষ্ণু চক্রবর্তীর নামও আছে। তিনি পেতেন ১০ টাকা করে। সারদা দেবীর খাস দাসী প্যারী—যার কথা অনেক বার আছে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি কথায়। সে মাসমহিনা পেত এক টাকা। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রতি মাসে বেতন পেতেন ৩১ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ যে ফরাসী ভাষা শিখতেন তার প্রমাণ হেমেন্দ্রনাথবাবুর ফ্রেঞ্চ শিখিবার পড়িবার খরচ ৫০ টাকা। ১২৭১ সালের ১৫ আষাঢ় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। সেই বাবদ 'হরিএক খরচ ৮২।৯৩ পাই।' ১২৭১ সালের ২২ ভাদ্র অর্থাৎ ১৮৬৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ছোটছেলেদের জন্য প্রথম পড়ার বই আসে প্রথম ভাগ দুইখানা। সারদা দেবীর জন্যে আসে দেড় টাকা দামের আয়না এবং একখানা চৈতন্যচরিতামৃত। রবীন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথের জন্য প্রথম পড়ার বই আসে বর্ণপরিচয় ২ খানা, শিশুশিক্ষা ২ খানা। তারিখ ১৮৬৫ সালের ৬ জানুআরি। তাছাড়া 'সেজোবাবু (হেমেন্দ্রনাথ) মহাশয়ের হুকুমে বাটির জন্য কেতাব খরিদ—ভারতবর্ষের ইতিহাস ১ খানা, ব্যাকরণ কৌমুদী ১ খানা, ঋজুপাঠ ২ খানা।'

১২৭৪ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাসোহারা ছিল ৩০ টাকা।

ওই সালের ৪ অগ্রহায়ণ বিয়ে হয় স্বর্ণকুমারীদেবীর। মোট খরচ ৩০০১ টাকা ৮ আনা ৬ পাই। শরৎকুমারী দেবীর সাধভক্ষণ হয় হয় ২৫ চৈত্র। ওই উপলক্ষে শাড়ি কেনা হয় ১৬ টাকা ১০ আনা দিয়ে। রামতনু লাহিড়ীর মেয়ের বিয়ে হয় ২ ফাল্গুন। দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে বিয়েতে কৃষ্ণনগর যান দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। যাতায়াত ও যৌতুকের গিনিবাবদ খরচ হয় ৭৯ টাকা। ১২৭৪ সালের ৪ ফাল্গুন জন্ম হয় গগনেন্দ্রনাথেব। গগনেন্দ্রনাথের মুখ দেখে কর্ত্রীঠাকুরাণী সারদা দেবী দেন ৪ টাকা এবং কর্তা মহাশয় দেবেন্দ্রনাথ দেন ২৬ টাকা ১১ আনা।

জামাকাপড় গয়নাগাটির ব্যাপারে দেখেছি মোজাফফর খলিফার হিসাব—'বড়বাবুজী মহাশয়ের (দ্বিজেন্দ্রনাথ) কাপড় তৈয়ারি ২১ টাকা ২ আনা, শ্রীমতী বড়বধূ, মধ্যমবধূ, সেজবধূ ও সৌদামিনী ঠাকুরাণীদিগরের কাপড় তৈয়ারী—১৯ টাকা ১১ আনা, শরৎকুমারী সুন্দরীর কাপড় তৈরারি—১৩ টাকা ১১ আনা, স্বর্ণকুমারী সুন্দরীর কাপড় তৈয়ারী—১২ টাকা ১ আনা, বিছানা তৈয়ারী—৫ টাকা, সোমেন্দ্র দ্বিপেন্দ্র রবীন্দ্রবাবুর দীগর ৭ টাকা ২ আনা। রবীন্দ্রনাথের জন্য ১২টা ইজের তৈয়ারী বাবদ সেলাই খরচ পড়ে ১৫ আনা। 'বিনামা খরিদ রবীন্দ্রনাথ ১ জোড়া—১২ আনা। বড় বধূ ও মধ্যম বধূর ৯ হাতি ধুতি একজোড়া ২ টাকা ১৪ আনা।' ৯ হাতি ধুতি সম্ভবত গায়ে তেল মাখার ও স্নানের।

তখন সোনার ভরি ছিল সাড়ে এগারে টাকা। নীলমণি স্যাকরা দ্বিজেন্দ্রনাথের স্ত্রী সর্বসুন্দরী দেবীর জন্যে ডায়মণ্ড কাট গোট তৈরি করে নেয় ২৩৮ টাকা ৮ আনা এবং সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর জন্যে নারকেল ফুল লবঙ্গকলি তৈরি করে নেয় মোট ২২৭ টাকা। স্যাকরা ডেকে গয়না না বানালে সোজাসুজি কেনা হত ইসফানি হিপাতুল্লা অ্যাণ্ড কোং থেকে। মোজাফফর খলিফার পর আসে ফতেউল্লা দর্জি। তাঁকে দিয়ে রথীন্দ্রনাথ ছুটো পাগড়ি

বানান পাঁচ টাকা দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ একসঙ্গে বানান ১২টা পাজামা ১২টা পানজাবি!

দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্রের নাম অরুণেন্দ্রনাথ। তার অন্নপ্রাশন হয় ১৮৬৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর। খরচ হয় ৮২ টাকা ১০ আনা ৯ পাই। সেইদিনই গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে এক পার্টি হয়। তার খরচ ৩৯ টাকা ১২ আনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির সদস্য ছিলেন তার প্রমাণ প্রতি মাসে ১০০ টাকা চাঁদা দেওয়ার হিসাবে। সত্যেন্দ্রনাথকে বিলেতে কত টাকা পাঠানো হত তাও আছে।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সাড়ে তিন, তখন তাঁর জন্য এক ডজন মোজার দাম পড়ে ৩ টাকা ১২ আনা। রবীন্দ্রনাথের ১২টা ইজেরের দামও ১২ আনা। রবীন্দ্রনাথের জন্য ১২টি পিরান কেনা হয় ৫ টাকা ৫ আনা ৬ পাই দিয়ে। আর একই দিনে কেনা হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বনাতের চাপকান। দাম ৩ টাকা এবং প্যান্ট ১টা ১ টাকা। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী পরতেন বনাতের মেরজাই। সেলাই বাবদ প্রতিটি পাঁচ আনা হিসাবে ৯টির খরচ পড়ে ২ টাকা ১৩ আনা। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা কোর্তা-ঘাগরা পরতেন সেকালে, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের দিদি সুকুমারীর জন্যে ১৪টি কোর্তা ১৩ টাকা ৫ আনা ৬ পাই দিয়ে এবং ৭টি ঘাগরা ১১ টাকা ৬ আনা ৯ পাই দিয়ে কেনা হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তির খরচ, সোমপ্রকাশ পত্রিকা কেনার খরচ, ১৮৬৫ সালের ১০ জানুআরি মঙ্গলবার 'কর্তা-মহাশয়ের শান্তিনিকেতনে দ্বিতীয়বার শুভাগমন' বাবদ খরচ ১২৩ টাকা ১০ আনা। 'জ্যোতিরিন্দ্রবাবু শান্তিনিকেতন গমন করেন, এজন্য বস্ত্রাদি পাঠানোর টিনের তোরঙ্গ' ২ টাকা ১২ আনা। শ্রীযুক্ত কর্তাবাবুর মেদিনীপুর যাতায়াতের খরচ ৪০২ টাকা ৩ আনা ৫ পাই।

রবীন্দ্রনাথের বিয়ের বিস্তারিত খরচের বিবরণ আছে ১৮৮৩-৮৪ সালের ক্যাশ বইয়ে। বিয়েতে মোট খরচ হয় ৩২৮৩ টাকা ৩ পাই। বিয়ে উপলক্ষে হীরে কেনা হয় ১৭১২ টাকা ১ আনায়। হীরে আনতে গাড়িভাড়া লাগে ১ টাকা ৫ আনা। নতুন বৌয়ের জন্যে কাপড় আসে ৭০ টাকা দিয়ে। পৌনে একুশ ভরির দু'গাছি সোনার বালা ৩৬৮ টাকা ৭ আনায় বড়বাজারে বিক্রি করে তার থেকে তৈরি করা হয় আংটি, তাগা ইত্যাদি। কন্যাপক্ষের লোকদের বিদায় প্রণামী দেওয়া হয় ৯৬ টাকা। বউয়ের শাল কেনা হয় ১৭৫ টাকায়, গরদ ৩০ টাকায়। চেলির দাম পড়ে ৭০ টাকা। হেরম্বনাথ তর্করত্ন সম্ভবত ছিলেন পুরোহিত। তাঁকে দক্ষিণা দেওয়া হয় ৮ টাকা। বিয়ে হয় কন্যা-আহ্বানে। তাই রবীন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়ির লোকদের কলকাতা আনিয়ে আলাদা বাড়িতে রাখা হয়। শ্বশুর বেণীমাধব রায়ের জন্য বাড়ি ভাড়া দেন কন্যাপক্ষই। তাঁর পথের ও বাসখরচা বাবদ দেওয়া হয় আলাদা ৬০ টাকা।

পরবর্তী ১৮৮৪-১৮৮৫ সালের খাতায় নববধূ মৃণালিনীর লরেটো স্কুলের পড়ার খরচ রয়েছে। বোর্ড ও টিউশন বাবদ মাসিক খরচ হত ১৫ টাকা।

বিশ্বভারতীর মার্কা দেওয়া ২০৬ নম্বর খাতায় রয়েছে পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির খরচের হিসাব। মহর্ষি তখন জোড়াসাঁকো ছেড়ে থাকতেন ওখানে। সঙ্গে বিধবা বড় মেয়ে সৌদামিনী দেবী। মহর্ষি যে নিয়মিত অডিকলোন ব্যবহার করতেন, তার প্রমাণ ১২৯৪ সালের ১২ ফাল্গুন পনেরো টাকায় দেড় ডজন ফাইবর্স অডিকলোন কেনা হয়। 'কর্তাবাবু মহাশয়ের জন্য।' ১২৯৪ সালের ৪ পৌষ রবিবার মহর্ষিদেবের নাতি নীতিন্দ্রনাথ হিতেন্দ্রনাথ ক্ষিতীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথ ঋতেন্দ্রনাথ রণেন্দ্রনাথ জ্যোৎস্না ঘোষাল—এই ৮ জনের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা হয়। সেই উপলক্ষে পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে ভুরি-ভোজনের আয়োজন করেন দেবেন্দ্রনাথ। আহারের মোট ব্যয় পাঁচ টাকা পনের আনা।

ওই বাড়িতে নিয়মিত আসত বিয়ার ও পাঠার মাংস। না, দেবেন্দ্রনাথের জন্যে নয়। হিসাবে লেখা আছে—'শ্রীযুক্তবাবু, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিয়ার খরিদের মূল্যশোধ ৮ টাকা এবং প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্য পাঁঠার মাংস তিন আনা। এই দু'জন ছিলেন পার্ক-স্ট্রীট বাড়ির নিত্য অতিথি। মহর্ষির জন্যে রোজ রোজ আসত সোডা ওয়াটার। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর দিবানিদ্রা সেরে তিনি খেতেন। তাছাড়া খুব খেতেন পামরুটি পুডিং আর মোহনভোগ। মোহনভোগ তৈরি হত কাঁচা পেঁপে দিয়ে।

অক্ষয় মজুমদার ও কাঙালীচরণ সেন প্রায়ই যেতেন দেবেন্দ্রনাথকে গান শোনাতে। তাঁদের ট্রামভাড়া দেওয়া হত যাতয়াতের।

১২৯৪ সালের ৫ পৌষ কর্তাবাবুর জন্য যেসব জামাকাপড় আসে, তাতে লেখা— 'গেরুয়া রংয়ের কাসমেরি কেটে ১টা—৬ টাকা ৮ আনা, সাদা দাস্তানা ১ জোড়া—৪ আনা, ১০টা নেংটির জন্য জিন কাপড় ৩ গজ—১২ আনা, কামিজের জন্য নয়নসুখ কাপড় দেড় গজ —১২ আনা, একটি চোগা ২টা কোট ৯টা কামিজ অলটার করার মজুরি ৪ আনা হিসাবে।'

সৌদামিনী দেবী বিধবা। ব্রাহ্ম হয়েও একাদশী পালন করতেন নিয়মিত। একটি পাতায় দেখছি লেখা আছে 'বড়দিদি ঠাকুরানীর একাদশীর ফল ১ আনা ৯ পাই। পেঁপে ১ আনা, পেয়ারা ২ আনা ফুল ১ আনা, শশা ৬ পাই, শাঁকালু ৬ পাই।

দেবেন্দ্রনাথের এমনি আরও অনেক খাতা রয়েছে। প্রত্যেক খাতাতেই নানা রকম তথ্য। নানাজনের আহার বিহারের মেজাজ মর্জির নানা বিবরণও নানাভাবে ছড়ানো। রবীন্দ্রনাথের আমলের খাতাতেও প্রায় তাই। এই সব খাতাতে আবার খরচের হিসাব ভাগ করা :—(১) দান ও সাহায্য (২) মাহিনা (৩) বিদ্যাভ্যাস (৪) বাজে খাতা (৫) গাড়িভাড়া (৬) জিনিস খরিদ। (৭) কাপড় খরিদ (৮) অনুষ্ঠান (৯) চিকিৎসা এবং (১০) লৌকিকতা খাতা।

গাড়ি ভাড়া খাতাতেই রয়েছে যাতায়াতের খবর। ১৩০৪ সালের ৯ ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ যে কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ি গিয়েছিলেন তার হদিস রয়েছে ওই হিসাবে। কেননা সেই বাবদ গাড়িভাড়া লেগেছে আড়াই টাকা। ঠিক তেমনি জানা যায় মৃণালিনী দেবী কেশব সেনের বাড়ি গিয়েছিলেন ১৩০৪ সালের ৩০ ফাল্গুন। মৃণালিনী দেবীর মা যশোর থেকে শেয়ালদা হয়ে জোড়াসাঁকো আসেন ১৯০০ সালের ১৮ জানুআরি। ১৮৯৮ সালের ৯ জুন গৃহশিক্ষক মিঃ লরেন্স বোলপুর যান। এবং যাতায়াত বাবদ খরচ হয় দেড় টাকা। রবীন্দ্রনাথ ঘন ঘন যেতেন নিমতলা স্ট্রীটে—তাঁর বন্ধু প্রিয়নাথ সেনের বাড়িতে। অন্য একটি হিসাবের খাতায় দেখছি তাঁর আট দিনের যাতায়াতের খরচ দেড় টাকা। তাছাড়া কলকাতায় থাকলে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই যেতেন বিডন স্ট্রীট বালিগঞ্জ ও জোড়াগির্জা অঞ্চলে। সাধারণত চড়তেন ট্রাম। মাঝে মাঝে ঘোড়ার গাড়ি। কদাচিৎ পালকি। ঠাকুরবাড়ির লোকেরা প্রায়ই যেতেন বোলপুর। আর যেতেন পুরী। তখন হাওড়া-পুরী তৃতীয় শ্রেণীর রেল ভাড়া চার টাকা চৌদ্দ আনা। ১৯০০ সালে ১৮ ফেব্রুআরি যশোর যান রবীন্দ্রনাথ। যশোরের কোথায়? শ্বশুরবাড়িতে? নাকি পূর্ব-পুরুষের ভিটা দেখতে?

'শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের' ক্যাশ বহি অনেকগুলো। ১৩০৭ থেকে ১৩১০ বঙ্গাব্দের একখানি বিরাট জাবদা খাতার গোড়াতেই দেখতে পাচ্ছি ১৯০০ সালের ২৭ এপ্রিল শুক্রবার ছোট বধূ ঠাকুরাণী অর্থাৎ মৃণালিনী দেবীকে হাতখরচ বাবদ দেওয়া হয়েছে পঞ্চাশ টাকা, 'কণিকা' বই ছাপানোর জন্যে কাগজ কেনা হয়েছে ১৮ টাকা ৮ আনা ৯ পাই দিয়ে, 'কল্পনার' জন্যে কাগজ কিনতে হয়েছে ১৭ টাকা ২ আনা ৬ পাইয়ের, ১৯ মে তারিখে খোদ বাবু মহাশয়ের জন্য গরদের সাদা ধুতি একটা ও টুইল চাদর একখানা মূল্য ২৫ টাকা ১২ আনা, লরেন্স সাহেবের জন্য কটন ড্রিল কুড়ি গজ ৭ টাকা ১৩

আনা, বিলাতী জুতা এক জোড়া ৪ টাকা ১২ আনা, বিডন স্ট্রীট ও বালিগঞ্জ যাতায়াত গাড়ি ভাড়া ৪ টাকা ১০ আনা ৬ পাই, ৫ রোজ ধর্মতলায় যাতায়াতে ১ টাকা ১৩ আনা, ৬ রোজ বালিগঞ্জ যাতায়াতে ৩ টাকা ২ আনা, দান ও সাহায্য বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ২ টাকা, দয়ার মা ২ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ বই কিনতেন থ্যাকার স্পিংক থেকে, স্টেশনারি জিনিস আনতেন চন্দ্র ব্রাদার্স থেকে। প্রসাধন দ্রব্য আসত বাথগেট থেকে। রবীন্দ্রনাথ গায়ে মাখতেন ভিনোলিয়া সাবান, (দাম ১ টাকা ১৪ আনা।) মাথায় কুন্তলীন। থ্যাকার স্পিংক থেকে ১৯০০ সালের ১২ জুলাই তিনি বই কিনেছেন ১০২ টাকার। ছেলেমেয়েদের জন্য দাঁত মাজার টুথপেস্ট কেনা হত না। আসত দন্তমঞ্জন। রথীন্দ্রনাথের জন্যে ৬ কৌটা দন্তমঞ্জন কেনা হয়েছে ৬ আনা দিয়ে। আর এসেছে নিমের তেল। জামা-কাপড় আসত জি. সি. মল্লিকের দোকান থেকে। বাংলা বই আসত সিটি বুক সোসাইটি থেকে। এই দোকান থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের বই— আনন্দমঠ দুর্গেশনন্দিনী চন্দ্রশেখর দেবীচৌধুরাণী ইত্যাদি এবং শিশু-শিক্ষা প্রথম ভাগ ও চাইল্ডস গ্রামার কিনে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদা পাঠিয়েছেন ওখানকার স্কুলের জন্যে। বাড়িতে আসত সোমপ্রকাশ ও বীণাবাদিনী পত্রিকা। আসত অমৃতবাজার পত্রিকা। ১৮৯৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের হিসাবে দেখা যাচ্ছে অমৃতবাজার পত্রিকার চাঁদা দেওয়া হয়েছে ১০ টাকা। তলায় লেখা ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৯৮ সালের অগস্ট। ১৯০১ সালে স্ট্যাণ্ডার্ড ইন্টারন্যাশনাল থেকে রবীন্দ্রনাথ আনান লাইব্রেরি অভ ফেমাস লিটারেচার। মাসিক চাঁদা ১০ টাকা।

ঔষধ আসত জুবিলি ফার্মেসি এবং বটকৃষ্ণ পালের দোকান থেকে। এলোপ্যাথ কবিরাজ হোমিওপ্যাথ—তিন রকম ডাক্তারই আসতেন ঠাকুরবাড়িতে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাঃ প্রতাপ

মজুমদার, ডাঃ এম.এন. ব্যানার্জি, ডাঃ অক্ষয়কুমার দত্ত, কবিরাজ বিজয়-রত্ন সেন, ডাঃ ডি. এন. রায়, ডাঃ যত্নাথ মুখোপাধ্যায় কবিরাজ বসন্ত-কুমার সেন, ডাঃ অঘোরনাথ ভাদুড়ি ডাঃ জে. এন. মজুমদার প্রমুখ।

খাওয়া-দাওয়া প্রধানত হত বাড়িতে। মাঝে মাঝে ওরা যেতেন গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে। পূর্বে বর্ণিত অরুণেন্দ্রনাথের অন্নপ্রাশনের পর একবার বড় খাওয়া হয় গ্রেট ইস্টার্নে। তারপর দেখছি ২৮।১।৯৯ তারিখে নাটোরের মহারাজাকে আপ্যায়িত করা হয় ৬১ টাকা ৩ আনা খরচ করে। ১২৭৪ সালের ৪ ফাল্গুনের আর একটি হিসাবে লেখা আছে উইলসন হোটেলের বিল ৫৬ টাকা। তাছাড়া ৩।৭।৯৭ তারিখের খাতায় লেখা আছে লোকেন্দ্র পালিতের জন্য হুইস্কি এক বোতল ২ টাকা ১২ আনা।

রবীন্দ্রনাথের শাশুড়ি প্রায়ই আসতেন। তিনি যশোর ফুলতলা থেকে এসে পাথুরিয়াঘাটার এক বাড়িতে থাকতেন। সেখান থেকে দেখতে আসতেন মেয়ে মৃণালিনী দেবীকে। ফুলতলা মামার বাড়ি থেকে কবি সন্তানদের জামা-কাপড় খাবার-দাবারের পার্সেলও আসত ডাকে। ১৮।২।১৯০০ তারিখে লেখা 'শ্রীমতী বেলাদেবীর নামে যশোর ফুলতলা হইতে পার্সেল আসার বাড়তি মাশুল ৪ আনা, ভাগ্যিস বাড়তি মাশুল লেগেছিল, তাই মিলল এই তথ্য। ১৯০০ সালের ২৭ জানুআরি রবীন্দ্রনাথ তাঁর শাশুড়ির জন্যে কিনেছেন র‍্যালির থান।

চন্দ্র ব্রাদার্স থেকে রবীন্দ্রনাথ কিনেছেন কাগজ পেন হোলডার ও মাপের ফিতা দোয়াত কুন্তরবৃষ্য তৈল। ছোট খোকাবাবু শমীন্দ্র-নাথের জন্য জুতো কিনেছেন ১ টাকা ৯ আনা দিয়ে। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' হাজার কপি বাঁধাই বাবদ খরচ হয়েছে মোট ১৪ টাকা ৬ আনা। বিশ্বকোষ পুস্তকের ১৬ বারের চাঁদা দিয়েছেন ২০ টাকা। লৌকিকতা খাতে নগেন্দ্রনাথ বসুমল্লিকের পুত্রের বিবাহের আইবুড়ো ভাতে কিনেছেন বেনারসী জোড় ২২ টাকায়। তারই মাঝখানে বিক্রির জন্যে ২৯ অকটোবর গুরুদাসের দোকানে ক্ষণিকা ২৫ ও কণিকা ২৫

খানা পাঠানোর মুটে ভাড়া লেগেছে এক আনা। মধ্যম কন্যা রেণুকার জন্যে বিলাতী শাড়ি দু জোড়ার দাম পড়েছে ৫ টাকা ৪ আনা, কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর জন্য লং ক্লথ ৭ আনা এবং রথীন্দ্রনাথের দুটি পাগড়ির জন্যে খরচ পড়েছে ৫টাকা ৮ আনা। শমীন্দ্রনাথের জন্যে এসেছে শ্লেট ও পেন্সিল।

১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে কেনেন এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা। দাম পড়ে ১৩ পাউণ্ড ১৩ শিলিং—অর্থাৎ ২০৫ টাকা। পরের সালের দোসরা জানুআরির হিসাবে লেখা রথীবাবুর জন্যে নিমের তেল দু টাকা এবং দন্তমঞ্জন ছয় কৌটা ছয় আনা। সেই বছরই রথীবাবু কৃষ্ণনগরে গিয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। পরীক্ষার ফি দিতে হয় ১০ টাকা। তারিখ ১৯ জানুআরি। অন্য খরচ পড়ে ৪১ টাকা ১২ আনা ৯ পাই। সেই দিনই রেণুকার অসুখ। হোমিও-প্যাথ ডাঃ ডি. এন. রায় আসেন। তাঁর ফি ৮ টাকা। রথীবাবুব তখন ছিল দুর্বল স্বাস্থ্য, তাই ১৪।২।১৯০৩ তারিখে কডলিভার তেল কেনা হয়েছে সওয়া টাকায়।

তার কিছুদিন পরেই জামাইষষ্ঠী। বড় জামাই শরৎকুমার চক্রবর্তীর কাছে মজঃফরপুরে পাঠানো হয় ১০০ টাকা। সেই দিনই দ্বরকিন সন্সে হারমোনিয়াম মেরামতিতে খরচ লাগে ১৫ টাকা। মাধুরীলতা বাজাতেন সেতার ও এসরাজ। ১৮৯৮ সালের ৯ জুন এই দুই যন্ত্রের মেরামাত বাবদ খরচ পড়ে ৪ টাকা।

৩৬৩ নং খাতায় ১৩০৩-১৩০৪ সালের হিসাবে ১৮৯৭ সালের কংগ্রেসের চাঁদা দেওয়া হয়েছে ৬ টাকা। সেই বছরেই কর্তাবাবু মহাশয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীমতী ছোট বধুঠাকুরাণীর ৩ জোষ্ঠ পার্ক স্ট্রীট যাতায়াত বাবদ খরচ এক টাকা দশ আনা।

১৮৯৮ সালের ২১ ফেব্রুআরি রবীন্দ্রনাথের জন্যে পেশোয়ারী জুতো দু জোড়া কেনা হয়েছে সাড়ে তিন টাকায় এবং সেই দিনই 'রথীন্দ্রবাবু ও বেলা দেবীর চৌরঙ্গীতে তামাসা দেখতে যাওয়ার গাড়ি

ভাড়া দেড় টাকা।’ তামাসা দেখবার ব্যয় ১০ টাকা! কী তামাসা? থিয়েটার, না সার্কাস? নাকি অন্য কিছু? তার কয়েক মাস পর ৪ জুন রবীন্দ্রনাথের বালিগঞ্জ বাড়িতে থিয়েটার দেখতে যাওয়ার গাড়ি ভাড়া ২ টাকা। কী থিয়েটার? তাঁর নিজের লেখা, না অন্য কারও?

বিদ্যাভ্যাস খাতায় রবীন্দ্রনাথের পুত্র-কন্যাদের জন্য আসত নানা রকম জিনিস। শমীন্দ্রনাথের জন্য ড্রয়িং বুক, নিব ও হ্যাণ্ডেল, বেণুকার জন্য কথামালা রথীন্দ্রনাথের জন্য ভূ-প্রদক্ষিণ ও ইউরোপের ম্যাপ, মাধুরীলতার জন্য বীণাবাদিনী পত্রিকা, মীরা দেবীর জন্য শিশুশিক্ষা ও পেনি এটলাস। চিত্তরঞ্জন দাসের বোন মৃণালিনী দেবীর সই, নামকরা গাইয়ে অমলা দাসের জন্যে এসরাজ কেনা হয়েছে ৬ টাকা দিয়ে। জুতো কেনা হয়েছে পৌনে দু টাকায়। রথীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন মিঃ লরেন্স। তাঁর যাবতীয় জিনিস-পত্র, জুতো, জামা বিছানা, কেনা হত বারোয়ারি হিসাব থেকে। তার মাস মাইনে ছিল ৫০ টাকা। অন্য গৃহশিক্ষক শিবধন বিদ্যার্ণব এবং জগদানন্দ রায়েরও মাস মাইনে ৫০ টাকা। গান শেখাতেন শ্যামসুন্দর নামে গায়ক।

১৯১৫ সালের সাহায্য খাতায় দেখতে পাচ্ছি ১৬ ফেব্রুআরি শিল্পী মুকুলচন্দ্র দে-কে দেওয়া হয়েছে ৪৭ টাকা। অজিতকুমার চক্রবর্তীর কিছু টাকা জমে ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। তার থেকে ১৯২২ সালের ২৮ এপ্রিল দেওয়া হয়েছে ১০০ টাকা। ১৯১৫ সালের ১৮ মার্চ হয় শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব। সেই সময়ে লেখা—‘২৬ ফাল্গুন তারিখে যে উৎসব হয় সেই সময় ক্রান্তি সিংহের পাগড়ি বাসন্তী রং দ্বারা রঞ্জিত থাকায় ভুলক্রমে তাহা উৎসবের কাপড়জ্ঞানে ছিঁড়িয়া ফেলা হয়. এজন্য তাহার মূল্য দেওয়া হয় আড়াই টাকা।’

১৯২১ সালে হোমরুল লীগে রবীন্দ্রনাথ ১৯২০ সালের চাঁদা দেন ২০ টাকা। এণ্ডরুজ সাহেব সেবার বৃন্দাবন যান। সেই বাবদ দেওয়া হয় ৫০ টাকা। বিদ্যালয় খাতায় নন্দলাল বসুকে দেওয়া

হয় ৫০০ টাকা এবং বিধুশেখর শাস্ত্রীকে ৪০০ টাকা। বিদ্যালয় চালাতে ধার নেওয়া হয়েছিল দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী ও নেপালচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে। সেই বাবদ সুদ দেওয়া হয় যথাক্রমে ৫৩ টাকা ৫ আনা ৪ পাই, ৩০ টাকা এবং ৭০ টাকা।

শান্তিনিকেতনের ছেলেরা একবার বাঘ শিকার করতে যায়। নেপালী ছাত্র নরভূপ রাই আহত হন বাঘের আঁচড়ে। ১৯১৭ সালের ১২ জুলাই তার অপারেশনের ক্লোরোফর্ম কেনা হয় ২ টাকা ১৪ আনা দিয়ে। মাধুরীলতার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ চালু করেন মাধুরীলতা বৃত্তি। প্রথম প্রাপক শশধর সিংহ, পরবর্তীকালে বিখ্যাত সাংবাদিক। বৃত্তির পরিমাণ ২৫ টাকা। ১৯১৯ সালের ডাকঘর নাটকের প্রোগ্রাম ছাপানো হয়। ২৫ টাকা দিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে। গায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৩৬ টাকা দেওয়া হয় ডাকঘর নাটক অভিনয়ের জন্য।

শশিকুমার হেস নিয়মিত যাতায়াত করতেন ঠাকুরবাড়িতে। ১৮০১ সালে তাঁর আপ্যায়নের জন্য আনা হয় ১ টাকার সন্দেশ। মতিচাঁদ নাখোদার কাছ থেকে ধার নেওয়া হয় ৪০ হাজার টাকা। শতকরা বার্ষিক ৭ টাকা হারে তাঁকে সুদ দেওয়া হত। ১৯০১ সালের অক্টোবরে এক মাসের সুদ দেওয়া হয় ২৩৩ টাকা ৫ আনা ৩ পাই। নতুন বাড়ি বিচিত্রা তৈরির খরচও আছে খাতাতে।

কবিজায়া মৃণালিনী দেবী অসুস্থ হন ১৯০২ সালে। শান্তি-নিকেতন থেকে তাঁকে কলকাতা আনা, ডাক্তার নার্স আনা, ওষুধ পথ্য কেনা ইত্যাদি প্রতিদিনের হিসাব থেকে জানা যায়, মৃণালিনী দেবী কীভাবে শেষ শয্যা নেন। ধীরে ধীরে তাঁর জীবনীশক্তি নষ্ট হয়, তিনি চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েন এবং অবশেষে নেন চিরবিদায়।

১৯০২ সালের আগস্টে দেখতে পাচ্ছি ছোট বধূঠাকুরাণীর সংসার খরচ বাবদ ১৮৩ টাকা, অতিথি সেবা বাবদ ১১৫ টাকা ৭ আনা ৬ পাই এবং গাভীক্রয় বাবদ ১৯ টাকা। তারপর সেপ্টেম্বর মাসে ছোট

বধূর জন্য ঔষধ ক্রয় ৩ টাকা এবং অজীর্ণের ওষুধ ১২ আনা। সেই মাসেই তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতায় আসেন। বোলপুর থেকে হাওড়া খরচ পড়ে ৪০ টাকা। হাওড়া থেকে জোড়াসাঁকো ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া ২ টাকা ৩ আনা ৬ পাই।

পরের মাস অক্টোবর। মৃণালিনী দেবীর জন্যে এসেছে সেণ্ট র‍্যাপল ওষুধ ২ টাকায়। তারপর একের পর এক ওষুধ কেনা হচ্ছে দোকান থেকে। ডাঃ ডি. এন. চট্টোপাধ্যায়ের ওষুধের বিলও মেটানো হচ্ছে। একই সঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়েন মধ্যম কন্যা রেণুকা। তাঁর জন্যেও আসে ওষুধ ও থার্মোমিটার। মৃণালিনী দেবীর জন্যে আসে রেঞ্জার্স ফ্রুট ১ বোতল ১ টাকা দিয়ে। কেনা হয় হোমিওপ্যাথির ওষুধ। ৮ রোজের ৮ পুরিয়ার দাম ৪ আনা। তাছাড়া এ্যালোপ্যাথি ওষুধ আসে বাথগেট থেকে।

. ওই মাসেই রথীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বোলপুরে। কয়েকদিন পর ৩ নবেম্বর আবার টেলিগ্রাম করে তাঁকে আনা হল কলকাতায় মায়ের কাছে। তাঁকে নিয়ে আসেন তাঁর একজন শিক্ষক —শিবধন বিদ্যার্ণব।

নবেম্বর মাসে অবস্থার আরও অবনতি। ওষুধের পরিমাণ বাড়ল, ডাক্তারদের আনাগোনা বাড়ল, বাড়ল রবীন্দ্রনাথের ছোটা-ছুটি। গোলাপমোহিনী সরকার নামে একজন নার্সকেও আনা হল। ডাক্তার থাকেন বিডন স্ট্রীটে। তাঁর বাড়িতে রোজ যেতেন রবীন্দ্রনাথ। উদ্বেগ নিয়ে। দুশ্চিন্তা নিয়ে।

১৩ নবেম্বর মৃণালিনী দেবীর ভাইকে টেলিগ্রাম করা হল চলে আসতে। ডাঃ ডি. এন. রায় এবং ডাঃ ডি. এন. চ্যাটার্জি আসছেন রোজ। আসছেন ডাঃ জে. এন. মজুমদার। পথ্য হিসাবে আসতে লাগল কমলালেবু ও বার্লি। এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি দুটোই চলছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও দিচ্ছেন বায়োকেমিক ওষুধ। মৃণালিনী দেবীর মাও অসুস্থা কন্যাকে দেখতে রোজ আসছেন পাথুরিয়াঘাটা

থেকে। আসছেন পালকিতে। প্রতি খেপে ভাড়া আট আনা।

মৃণালিনী দেবী আর বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না। এল বেড প্যান, অয়েল ক্লথ! এল এসেন্স অব চিকেন, ওষুধ খাওয়ার পেয়ালা, মেজার গ্লাস। আনা হচ্ছে ভেড়ার দুধ। দারোয়ান রোজ নিয়ে আসে অন্য কোথাও থেকে। ট্রামে চড়ে।

তারপর হঠাৎ একদিন খাতার পাতা খালি। ১৯০২ সালে ২৩ নবেম্বর মৃণালিনী দেবীর জীবনাবসান। সংসার খরচের জন্যে টাকা যাচ্ছে তাঁর জ্ঞাতি পিসিমা রাজলক্ষ্মী দেবীর কাছে। মৃণালিনী দেবী খাতায় আর নেই।

না, আছেন। আছেন পারলৌকিক ক্রিয়ায়। শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বিছানা তৈরি হয়েছে ৪১ টাকা ৮ আনায়, জিনিস খরিদ হয়েছে ৯ টাকা ১১ আনা ৬ পাইয়ে। তারপর স্বর্গীয়া ছোট বধূঠাকুরাণীর ১৩০৯ সালের ৭ অগ্রহায়ণ রাত্রে মৃত্যু হওয়ায় অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ব্যয় ১ ফর্দ ২৮ টাকা ৬ পাই। শ্রীমতী বেলা দেবীর চতুর্থী শ্রাদ্ধ ও হবিষ্য করেন তাহার ব্যয় ২২ টাকা ১৫ আনা ৩ পাই। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রবাবু মহাশয় শ্রাদ্ধ করেন তাহার ব্যয়—১৪২ টাকা ১২ আনা ৩ পাই। হবিষ্য করার ব্যয় ১৯ টাকা ১ আনা ৬ পাই।'

পুনশ্চ আর একটি সংবাদ। রবীন্দ্রনাথ মৃতা স্ত্রীর ছবি সযত্নে বাঁধিয়ে আনছেন বাইরে থেকে। তারই একখানা পাঠালেন বড় মেয়ে বেলার কাছে মজঃফরপুরে।—'ওই ছবি বেলা দেবীর কাছে পাঠানোর পার্সেল ব্যয় ১ টাকা ৩ আনা ৬ পাই।'

তথ্য নীরস, নীরস টাকা আনা পাইয়ের হিসাব। কিন্তু সংখ্যা ছাড়িয়ে হিসাব ছাড়িয়ে সেও অনেক কথা বলে, বলে হাসি-কান্না আনন্দ-বেদনার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। আমরা চেনা মানুষকে নতুন করে চিনি, তাদের সম্পর্কে আরও কৌতূহলী হই। ঠাকুর-বাড়ির হিসাবখাতার পাহাড়ে কৌতূহল জাগানো এমনি আরও কত তথ্য লুকিয়ে আছে পাতাবন্দী হয়ে।

ছাত্র রবীন্দ্রনাথ



রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বলেছেন, 'ইস্কুলপালানো ছেলে।' সেই ইস্কুলপালানো ছেলেই পরে ইস্কুল খুলেছিলেন ভুবনখ্যাত ভুবনডাঙ'র মাঠে। তিনি শুধু তার প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ছিলেন না, নিয়মিত শিক্ষকতা করেছেন দিনের পর দিন। ক্লাসে এসে রুটিন মাফিক একসঙ্গে ইংরেজি বাংলা ও সংস্কৃত পড়িয়েছেন ছাত্রদের। তাছাড়া শিলাইদহে পুত্রকন্যাদের জন্যে যে-গৃহবিদ্যালয় খোলা হয়েছিল, সেখানে পিতাকে শিক্ষকের ভূমিকা নিতে হয়েছে বারবার। মাস্টার-মশাই হিসাবে তাঁর অনন্যতার সাক্ষ্য দিতে পারেন একালে বৃদ্ধ, সেকালে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা। জীবনস্মৃতির বিবরণ অনুযায়ী বাল্যে তাঁর প্রথম ছাত্ররা হল জোড়াসাঁকো বাড়ির বারান্দার রেলিং। একটি বেত হাতে তাদের সামনে বসে মাস্টারি করতেন। সেই নীরব ক্লাসের উপর ভয়ংকর মাস্টারি চলে বেশ কিছুকাল।

এই শিক্ষক রবীন্দ্রনাথও এককালে ছাত্র ছিলেন। কেমন ছাত্র ছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ তিনি নিজেই দিয়েছেন নানা স্মৃতিকথায়। ডিগ্রি না হয় না'ই ছিল, ছাত্র যখন ছিলেন, তখন তাঁর শিক্ষকও নিশ্চয় ছিলেন অনেকে। তাঁরা কারা? এঁদের সুসংবদ্ধ কোন পরিচয় তালিকা নেই, তবে নানা সূত্রে নানা জনের নাম সংগ্রহ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ কোন ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা পরীক্ষা পাশ করতে পারেন

নি কিংবা আদৌ পরীক্ষা দেন নি। তবু অনেকগুলি বিদ্যালয়ে তাঁকে কিছুদিন করে নিয়মিত হাজিরা দিতে হয়েছে। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি, সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল, ব্রাইটনের পাবলিক স্কুল ও লণ্ডন ইউনিভার্সিটি। সবার আগে অবশ্য পাঠ নিতে হয়েছে তাঁদের বাড়ির ঠাকুরদালানের পাঠশালায়। গুরুমশাই ছিলেন মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আনুষ্ঠানিকভাবে রবীন্দ্রনাথের হাতেখড়ি হয়েছিল কিনা জানা নেই, তবে তার জন্যে সর্বপ্রথম কী বই কেনা হয়, সম্প্রতি উদ্ধার করেছি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এক হিসাবের খাতা থেকে। ওই হিসাবে বিদ্যাভ্যাস খাতা নামে আলাদা একটি অংশ আছে। তাতে ১৮৬৫ সালের ৬ জানুআরির হিসাবে লেখা আছে, দাদা সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের জন্যে বর্ণ-পরিচয় ও শিশুশিক্ষা কেনা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাড়ে তিন। পরবর্তীকালের আর একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে "সেজোবাবু (হেমেন্দ্রনাথ) মহাশয়ের হুকুমে বাটির জন্য কেতাব খরিদ ভারতবর্ষের ইতিহাস ১ খানা, ব্যাকরণ কৌমুদী ১ খানা, ঋজুপাঠ ২ খানা।" এই বইগুলিও, অনুমান, রবীন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথের জন্যে কেনা। সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ তাঁর এই ছোট দু' ভাইয়ের পড়াশোনার ভার নিজে নিয়েছিলেন। তাছাড়া বিদ্যাসাগরের লেখা 'বোধোদয়' ছিল তাঁর আদিপাঠ্যের অন্যতম।

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখাপড়ার ইতিহাস শুরু করেছেন এইভাবে—"আমরা তিনটি বালক (দাদা সোমেন্দ্রনাথ, ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ ও নিজে) একসঙ্গে মানুষ হইতেছিলাম। আমার সঙ্গী দুটি আমার চেয়ে দুই বছরের বড়ো। তাঁহারা যখন গুরুমহাশয়ের কাছে পড়া আরম্ভ করিলেন আমারও শিক্ষা সেই সময়ে শুরু হইল।" এই পাঠশালার বিবরণ আছে ছেলেবেলা বইয়ে।—"পাড়াগাঁয়ের আরও একটি ছাপ ছিল চণ্ডীমণ্ডপে। ওইখানে গুরুমশায়ের পাঠশালা বসত। কেবল বাড়ির নয়, পাড়াপ্রতিবেশীর

ছেলেদেরও ওখানেই বিদ্যের প্রথম আঁচড় পড়ত তালপাতায়ই। আমিও নিশ্চয় ওইখানেই স্বরে-অ স্বরে-আ-র উপর দাগা বুলোতে আরম্ভ করেছিলুম। কিন্তু সৌরলোকের সবচেয়ে দূরের গ্রহের মতো সেই শিশুকে মনে-আনা-ওয়ালা কোন দূরবীন দিয়েও তাকে দেখবার জো নেই। তারপরে বই পড়ার কথা প্রথম যা মনে পড়ে সে ষণ্ডামার্ক মুনির বিষম ব্যাপার নিয়ে, আর হিরণ্যকশিপুর পেট চিরছে নৃসিংহ অবতার—বোধকরি সীসের-ফলকে-খোদাই করা তার একখানা ছবিও দেখেছি সেই বইয়ে। আর মনে পড়ছে কিছু কিছু চাণক্যের শ্লোক।"

রবীন্দ্রনাথের আরো মনে পড়েছে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' নামে একটি বাক্য। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"তখন 'কর' 'খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' আমার জীবনের এইটিই আদিকবির প্রথম কবিতা।" সেই "আদিকবি" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং "কাব্যগ্রন্থ" বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ। কিন্তু এই উল্লেখে রবীন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ ভ্রান্তি আছে। বিদ্যাসাগরমশাই 'জল পড়ে পাতা নড়ে' লেখেন নি, বর্ণ পরিচয়ে আছে 'জল পড়িতেছে, পাতা নড়িতেছে।'

ইংরেজী পড়াতেন আর এক মাস্টারমশাই। প্রথম বই ফাস্ট বুক। ছেলেবেলা-র তার বিবরণ আছে।—"মাস্টারমশায় মিটমিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফাস্ট বুক। প্রথম উঠত হাই তারপর আসত ঘুম, তার পর চলত চোখ-রগড়ানি। বার বার শুনতে হত মাস্টারমশাইয়ের অন্য ছাত্র সতীন সোনার টুকরো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য মন, ঘুম পেলে চোখে নস্যি ঘষে। আর আমি? সেকথা বলে কাজ নেই। সব ছেলের মধ্যে একলা মুর্খু হয়ে থাকবার মতো বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারত না। রাত্রি ন'টা বাজলে ঘুমের ঘোরে ঢুলুঢুলু চোখে ছুটি পেতুম।"

এই মাস্টারমশাই সম্ভবত অঘোরবাবু। ছেলেবেলা-র আর এক জায়গাতে আছে—"অঘোর মাস্টার এসে উপস্থিত। শুরু হয়েছে ইংরেজি পড়া। কালো কালো মলাটের রীডার যেন ওৎ পেতে রয়েছে টেবিলের উপর। মলাটটা ঢলঢলে, পাতাগুলো কিছু ছিঁড়েছে, কিছু দাগি; অজায়গায় হাত পাকিয়েছি নিজের নাম ইংরেজিতে লিখে, তার সবটাই ক্যাপিটল অক্ষর। পড়তে পড়তে ঢুলি, ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠি। যত পড়ি, তার চেয়ে না পড়ি অনেক বেশি।"

এই পোশাকী মাস্টারমশাইরা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের আদিশিক্ষা ভৃত্য ও দাসীদের কাছে। তাদের কাছে তিনি শুনেছেন চাণক্য শ্লোক, কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর কাশীদাসী মহাভারত। ভৃত্যদের অন্যতম ঈশ্বর ছিল আগে গ্রামের পাঠশালার গুরুমশাই। সন্ধেবেলা রেড়ির তেলের বাতি জ্বালিয়ে ঈশ্বরের কাছে বসে তিনি রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী গোগ্রাসে গিলতেন। বাড়ির ভৃত্য-দাসী ছাড়াও গোমস্তা খাজাঞ্চিদের কাছে শুনতেন ছড়া আর রূপকথা। ছড়ার ছন্দ আর রূপকথার কাহিনী গোটা বাল্যকাল তাঁকে উন্মনা করে রেখেছিল। দুই খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্যে এবং কিশোরী চাটুজ্জে এই ব্যাপারে ছিলেন দুই প্রধান শিক্ষক। অতি দ্রুত ছড়া এবং দাশুরায়ের পাঁচালি পড়ে বালক রবীন্দ্রনাথের চিত্তে তাঁরা আলোড়ন তুলতেন। রবীন্দ্রনাথ পরে বলেছেন—"শিশুকালের সাহিত্যরস-ভোগের এই দুটি স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে। আর মনে পড়ে, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এলো বান।' ওই ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।"

বাড়ির পড়াশোনা সাঙ্গ হলে "কান্নার জোরে" সরকারীভাবে রবীন্দ্রনাথ ভর্তি হন গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে। এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার সামান্য ইতিহাস আছে। জীবনস্মৃতিতে কবি জানাচ্ছেন—"একদিন দেখিলাম দাদা এবং আমার বয়োজ্যেষ্ঠ

ভাগিনেয় সত্য ইস্কুলে গেলেন, কিন্তু আমি ইস্কুলে যাইবার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইলাম না। উচ্চৈঃস্বরে কান্না ছাড়া যোগ্যতা প্রচার করার আর কোনও উপায় আমার হাতে ছিল না। ইহার পূর্বে কোনোদিন গাড়িও চড়ি নাই, বাড়ির বাহিরও হই নাই, তাই সত্য যখন ইস্কুল-পথের ভ্রমণবৃত্তান্তটিকে অতিশয়োক্তি অলংকারে প্রত্যহই অত্যুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে লাগিল, তখন ঘরে আর মন কিছুতেই টিঁকিতে চাহিল না। যিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন, তিনি আমার মোহ বিনাশ করিবার জন্য প্রবল চপেটাঘাত সহ এই সারগর্ভ কথাটি বলিয়াছিলেন, 'এখন ইস্কুলে যাবার জন্যে যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে বেশি কাঁদিতে হইবে।' সেই শিক্ষকের নাম ধাম আকৃতি-প্রকৃতি কিছুই আমার মনে নাই; কিন্তু সেই গুরুবাক্য ও গুরুতর চপেটাঘাত স্পষ্ট মনে জাগিতেছে। এতোবড় অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী জীবনে আর কোনোদিন কর্ণগোচর হয় নাই।"

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে তিনি ছাত্র ছিলেন অল্পদিন। সেখানকার স্মৃতি বিশেষ মনে ছিল না। শুধু মনে ছিল একটি শাস্তির কথা—পড়া বলতে না পারলে ছাত্রকে বেঞ্চিতে দাঁড় করিয়ে তার দুই ছড়ানো হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলো স্লেট একসঙ্গে চাপিয়ে দেওয়া হত।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির পর নর্মাল স্কুল। এই স্কুল অনেকটা একালের গুরু-ট্রেনিংয়ের মতো। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সংলগ্ন মডেল স্কুলের ছাত্র। তখন তাঁর বয়স সাত কি আট। এই স্কুল শুরু হয় বিদ্যাসাগরের চেষ্টায়, সংস্কৃত কলেজের বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ যখন ছাত্র, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে এই স্কুলের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই স্কুলে শিশুদের মনোরঞ্জনে রোজ একটি ইংরেজি কবিতা গানের সুরে আবৃত্তি করতে হত। রবীন্দ্রনাথের তা ভালো লাগেনি। সেই আবৃত্তির চোটে 'ফুল অভ গ্লী, সিংগিং মেরিলি মেরিলি মেরিলি

বাক্যটি কীভাবে বিকৃত হয়ে উচ্চারণে 'কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং' হয়েছিল, তার সরস বিবরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই।

নর্মাল স্কুল রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি। সেখানকার সহপাঠী ছাত্রদের সংস্রব তাঁর কাছে "অশুচি ও অপমানজনক।" তাছাড়া শিক্ষক হরনাথ পণ্ডিতের কুৎসিত ভাষা তাঁকে পীড়া দিত। ফলে তিনি কোনদিন পণ্ডিতমশায়ের ক্লাসে তাঁর কোন প্রশ্নের জবাব দেন নি। বার্ষিক পরীক্ষায় কিন্তু তিনি সকলের চেয়ে বেশি নম্বর পান বাংলাতে। পরীক্ষক ছিলেন মধুসূদন বাচস্পতি। ক্লাস-টিচার হরনাথ পণ্ডিত নালিশ করলেন, পক্ষপাতিত্ব করে বেশি নম্বর দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বার পরীক্ষায় বসতে হল রবীন্দ্রনাথকে। এবার স্বয়ং সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পরীক্ষকের পাশে চৌকি নিয়ে বসেন। এবারও রবীন্দ্রনাথ ফার্স্ট।

কিন্তু নর্মাল স্কুলে রবীন্দ্রনাথের বেশিদিন থাকা হল না। বোধহয় বছর চারেক ছিলেন। ছাত্রবৃত্তির নীচের ক্লাস পর্যন্ত পড়ার পর রবীন্দ্রনাথ ভর্তি হলেন ফিরিঙ্গি স্কুল বেঙ্গল একাডেমিতে। নর্মাল স্কুলে শেখানোর চেষ্টা হল বাংলা, বেঙ্গল একাডেমিতে ইংরেজি। তাছাড়া ছিল বাড়িতেই পড়াশোনা। নানা বিদ্যায় তাঁকে পারদর্শী করে তুলতে চাইলেন কয়েকজন গৃহশিক্ষক। সর্বোপরি মাথার উপরে ছিলেন সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বিদ্বান করার সব রকম দায়িত্ব নেন। এই সম্পর্কে কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ বলছেন, বাংলা ভাষায় বিদ্যাচর্চার ভিত তৈরি করে দেন হেমেন্দ্রনাথ। তিনিই বুঝেছিলেন বিদেশীভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে প্রাধান্য দিলে সমূহ বিপদ। রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন, তার শিক্ষাজীবনে বাংলা বুনিয়াদ গড়ার জন্যে তিনি তাঁর মেজদাদার কাছে ঋণী।

বেঙ্গল একাডেমিও রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি। রবীন্দ্রনাথের

ভাষায় একাডেমির ফিরিঙ্গি ছাত্ররা 'দুর্বৃত্ত।' তিনি কোন স্কুলেই সহপাঠীদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেননি। ঠাকুরবাড়ির পোশাক ভাব ভাষা চালচলন—সব ছিল আলাদা। অভিজাত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনভিজাত অন্য ছাত্রদের মানসিক দূরত্ব ছিল শতযোজন। তাই রবীন্দ্রনাথ সহপাঠীদের আচরণ আদৌ বরদাস্ত করতে পারেন নি।

বেঙ্গল একাডেমিতে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই ক্লাস কামাই করতেন। ইস্কুলপালানোর শিক্ষা এই একাডেমিতে শুরু। স্কুল কর্তৃপক্ষও নিয়মিত ছাত্রবেতন পেতেন বলে কামাই নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। একাডেমির এক বাংলা ছাত্র—নাম হরিশচন্দ্র হালদার—রবীন্দ্রনাথের জীবনে কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। হালদার হ.চ.হ. নামে পরিচিত ছিলেন এবং ভালো ম্যাজিক দেখাতে পারতেন। বেঙ্গল একাডেমিতে পড়ার সময়ই রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয় এবং উপনয়নের পর পিতার সঙ্গে হিমালয়যাত্রা করেন। বাইরে থেকে ফিরে আবার কিছুদিন ক্লাস করেন একাডেমিতে। কিন্তু ক্লাসে আর মন টেঁকেনা, পালাতে পারলে বাঁচেন।

ইতিমধ্যে ছাত্র রবীন্দ্রনাথ অভিভাবকদের কাছে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ালেন। বিদ্যালয়ের গণ্ডীতে বাঁধাধরা নিয়মে আবদ্ধ বালককে উদ্ধার করতে উদ্যোগী হলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতারা। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বয়ং ভূমিকা নিলেন শিক্ষকের, রামসর্বস্ব পণ্ডিত সংস্কৃত শেখাতে লাগলেন বাড়িতে। তিনিই সর্বপ্রথম শকুন্তলা নাটকের কাব্যরস উদ্‌ঘাটন করেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধে রাজনারায়ণ বসুও রবীন্দ্রনাথকে পড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তারপর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি রবীন্দ্রনাথকে স্কুলের পড়ায় বাঁধতে না পেরে সাহিত্যরস পরিবেষণে উদ্যোগী হলেন। ভট্টাচার্য মশাই কুমারসম্ভব আর ম্যাকবেথ নাটক বুঝিয়ে বুঝিয়ে পড়াতে শুরু করলেন। ঔষধে ফল হল,

রবীন্দ্রনাথের সামনে নতুন জগৎ খুলে গেল। রবীন্দ্রনাথ পড়াশোনায় এতো উৎসাহিত হলেন যে, সমগ্র কুমারসম্ভব মুখস্থ করে ফেলেন, ম্যাকবেথ পুরো অনুবাদ করে ফেলেন বাংলায়। অন্য গৃহশিক্ষক রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য ছিলেন বিদ্যাসাগর মশায়ের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের হেড পণ্ডিত। তাঁর ছাত্র ম্যাকবেথ পুরো অনুবাদ করেছেন জেনে পাণ্ডুলিপিসমেত বালক-অনুবাদককে বিদ্যাসাগরের সম্মুখে হাজির করেন। মেট্রোপলিটন স্কুলের আর একজন শিক্ষক ব্রজনাথ দে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ-প্রতিভার খবর পেয়ে গোল্ডস্মিথের ভিকার অভ ওয়েক-ফিল্ড তর্জমা করতে দেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাতে উৎসাহিত হন নি।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৭২ সালে বেঙ্গল একাডেমি ছাড়েন এবং ১৮৭৩ সালে ভর্তি হন সেন্ট জেবিয়ার্স স্কুলে। মাঝের এক বছর নানা বিদ্যায় পারদর্শী হতে থাকেন গৃহবিদ্যালয়ে। কুস্তি সংগীত চিত্রকলা গ্রন্থপাঠ ইত্যাদি চলল এক সঙ্গে। প্রধান নির্দেশক হেমেন্দ্রনাথ। ভোরবেলা লেঙ্গট পরে হীরাসিং পালোয়ানের কাছে কুস্তি, তারপর সেই মাটিমাখা শরীরে জামা পরে পড়াশোনা। সকাল ছ'টা থেকে নয়টা। শিক্ষক নীলকমল ঘোষাল। পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ ও পদার্থবিদ্যা, রামগতি ন্যায়রত্নের বস্তুবিচার, সাতকড়ি দত্তের প্রাণিবৃত্তান্ত ও মাইকেলের মেঘনাদবধ। তাছাড়া জ্যামিতি গণিত ইতিহাস ভূগোলের বই। বিকেলে ড্রয়িং এবং জিমনাস্টিক শিক্ষক আসতেন শিক্ষাদানে। সন্ধ্যার পর ইংরেজি পড়াতেন অঘোরবাবু এবং সংস্কৃত জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য। রবিবার সকালে বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চা এবং সীতানাথ ঘোষের কাছে যন্ত্রযোগে প্রাকৃতবিজ্ঞানশিক্ষা। ইংরেজির শিক্ষক অঘোরবাবু ছিলেন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তিনি একদিন মৃত মানুষের কণ্ঠনালী এনে স্বরযন্ত্রের সমগ্র ক্রিয়াকৌশল শিক্ষা দেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অঘোরবাবু মেডিকেল কলেজের শব-ব্যবচ্ছেদ

গৃহে যান শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানবিতরণের জন্য। ক্যাম্বেল (বর্তমান নীলরতন) মেডিকেল স্কুলের এক ছাত্র আসতেন অস্থিবিদ্যা শেখাতে। এই কারণে একটি আস্ত নরকঙ্কাল রবীন্দ্রনাথের পড়ার ঘরে টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল। হেরম্ব তত্ত্বরত্ন নামে এক পণ্ডিত মুগ্ধবোধ পড়াতেন। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে বলছেন—"অস্থিবিদ্যার হাড়ের নামগুলো এবং বোপদেবের সূত্র দু'য়ের মধ্যে জিত কাহার ছিল ঠিক বলিতে পারি না। আমার বোধহয় হাড়গুলিই কিছু নরম ছিল।"

ওদিকে অঘোরবাবু প্যারী সরকারের ফার্স্টবুক ও সেকেণ্ডবুকের পর মকলক্স কোর্স অভ রীডিং শ্রেণীর একখানা বই রবীন্দ্রনাথকে ধরিয়ে দেন। বইটি রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি। ডিকেন্সের ওল্ড কিউরিওসিটি শপ পড়ে কিন্তু খুব ভালো লাগল। পিতার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে বাংলা অক্ষরে ছাপা জয়দেবের গীতগোবিন্দ পড়েও তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজে কনিষ্ঠপুত্রকে অনুষ্টুপছন্দে বাল্মীকির পুরো রামায়ণ পড়ে শোনান। তাছাড়া হিমালয়যাত্রার সময় পিতা পুত্রকে জ্যোতির্বিদ্যা শেখাতেন নক্ষত্র চেনাতেন এবং প্রক্টরের 'সবল জ্যোতিষ্ক' বই পড়ান।

১৮৭৪ সালে আবার ইস্কুল। এবার সেণ্ট জেবিয়ার্স। সেখানে ছিলেন দুই বছর। স্কুলের প্রগ্রেস রিপোর্টে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্য ছিল 'ইরেগুলার'। এই স্কুলে তিনি ক্লাসে প্রমোশন পেলেনই না। তবে স্কুলটির কয়েকজন অধ্যাপকের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে ছিল রবীন্দ্রনাথের মনে। যেমন ফাদার ডি পেনেরাণ্ডা ও ফাদার হেনরি। এঁরা ছিলেন সহৃদয় এবং সত্যিকারের শিক্ষক। রবীন্দ্রনাথ একবার ক্লাসের পরীক্ষা দেবার সময় হাত গুটিয়ে বসেছিলেন। ক্লাস টিচার পেনেরাণ্ডা দেখলেন, তাঁর ছাত্রের কলম সরছে না। তিনি এগিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথের পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বলেন, "টাগোর, তোমার শরীর কি ভাল নেই ?" এই সামান্য একটি কথায় রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষকের স্নেহশীল হৃদয়ের পরিচয় পান।

১৮৭৫ সালে রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ হয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চোদ্দ। মাতৃহীন বালক, তাই বিশেষ প্রশ্রয় পেতে থাকলেন বাবা দাদা ও বৌদিদের কাছে এবং তাদের পরোক্ষ সমর্থনেই রবীন্দ্রনাথ অতঃপর স্কুলে যাওয়া একেবারেই ছেড়ে দিলেন। বাড়িতে তখন গান বাজনা অভিনয় ছবি আঁকা সাহিত্য চর্চা, আর স্বাদেশিকতার আবহাওয়া। গণেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত স্বদেশী হিন্দুমেলার রেশ তখনও চলছে, দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখছেন স্বপ্নপ্রয়াণ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাজাচ্ছেন পিয়ানো, গুণেন্দ্রনাথ শুরু করেছেন উদ্যান চর্চা, নাটক লেখা অভিনয় দুই-ই চলছে সমান তালে। রবীন্দ্রনাথ স্কুলের পড়া সাঙ্গ করে নিজেকে যুক্ত করলেন সেই আবহাওয়ায়। সাকরেদী শুরু হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল, রামনারায়ণ তর্করত্ন নিয়মিত আসেন জোড়াসাঁকোয়। তাঁদের সঙ্গে কবি পরিচিত হন। যদুভট্ট এসে শেখান গান। রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে খ্যাতি অর্জন করতে লাগলেন কবি ও গাইয়ে হিসাবে। বাড়ির ভিতরে নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর উৎসাহ এবং বাড়ির বাইরে নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহচর্য রবীন্দ্রনাথকে সর্ববিদ্যাপারঙ্গম করে তুলল। কিশোর রবীন্দ্রনাথের সামনে খুলে যেতে লাগল নতুন নতুন দিগন্ত। ইতিমধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে একবার শিলাইদহে গিয়ে শিখে নিলেন সাঁতার, ঘোড়ায় চড়া ও বন্দুক চালনা।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সতেরো, অভিভাবকদের ইচ্ছে হল তাকে বিলেত পাঠানোর। রবীন্দ্রনাথ পাড়ি দিলেন লণ্ডন। মাঝখানে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের নির্দেশে তাঁর কর্মস্থল আমেদাবাদে রইলেন কিছুদিন। মেজদাদা স্বয়ং ভার নিলেন ভাইকে নানা বিষয়ে শিক্ষাদানের। সেখানে সত্যেন্দ্রনাথের চমৎকার লাইব্রেরি। খোপে খোপে সাজানো বই। রবীন্দ্রনাথ বেছে নিলেন টেনিসনের কাব্য-সংগ্রহ এবং ডাঃ হেবর্লিনের সংকলিত সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহ। তাছাড়া পড়লেন টেন-এর ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস। শিখলেন

মারাঠী ভাষা কিছু কিছু। পড়লেন দান্তের ডিভাইনা কমেডিয়া। আমেদাবাদ থেকে বোম্বাই। সেখানে সত্যেন্দ্রনাথের নির্দেশে মারাঠী তড়খড়-পরিবারে শিক্ষা নিলেন পাশ্চাত্য সহবতের। তারপর বিলাত। রবীন্দ্রনাথ ভর্তি হলেন ব্রাইটনের একটি পাবলিক স্কুলে। প্রথম দিনেই স্কুলের প্রিন্সিপাল রবীন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'হোয়াট এ স্প্লেন্ডিড হেড ইউ হ্যাভ।' এই স্কুলে সহপাঠী ছাত্ররা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করত। বিদেশী বলে অনেক সময় তাঁর পকেটে কমলালেবু বা আপেল গুঁজে দিয়ে তারা পালিয়ে যেত।

এই পাবলিক স্কুলে রবীন্দ্রনাথ বেশি দিন পড়েন নি। তারকনাথ পালিত স্কুল থেকে সরিয়ে এনে লণ্ডনে এক বাড়িতে একলা রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে দেন। বাড়িটি রিজেণ্ট পার্কের কাছে। এই বাড়িতেই একজন শিক্ষক এসে রবীন্দ্রনাথকে লাতিন ভাষা শেখাতেন। কিন্তু লাতিন ব্যাকরণে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল না। তারপর মিঃ বার্কার নামক একজন শিক্ষকের কাছে তিনি পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা শুরু করেন। প্রসঙ্গচ্ছলে উল্লেখ করছি. রবীন্দ্রনাথ পরে ফরাসী ও জার্মান ভাষাও শেখেন।

তারপর লণ্ডন ইউনিভার্সিটি। সেখানে রবীন্দ্রনাথ মাস তিনেক পড়াশোনা করেন। তাঁর সহপাঠী ছিলেন তারকনাথ পালিতের পুত্র লোকেন পালিত। ইউনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরিতে দুই বন্ধুতে পড়তে যেতেন। কিন্তু পড়াশোনার বদলে আড্ডা হত বেশি। তবে ইংরেজী সাহিত্য ও বাংলা শব্দতত্ত্ব নিয়ে দু'জনে আলোচনাও হত প্রচুর। বিলাতে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সংগীত ও পাশ্চাত্য নৃত্যচর্চা করে দুটি বিষয়েই পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে ইংরাজির অধ্যাপক হেনরি মর্লি শিক্ষক হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেন। মর্লির অধ্যাপনা-রীতি তাঁকে ইংরেজি সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করায়।

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথে রাণী চন্দকে তিনি ১৯৪১ সালের ১৭ এপ্রিল বলেছেন—"হেনরি মর্লির মতো শিক্ষক পাওয়া আমার জীবনের বড় একটা সৌভাগ্য। তাঁর পড়াবার পদ্ধতি ছিল নতুন ধরণের। তিনি কখনো শব্দের অর্থ করে করে পড়াতেন না। পাঠ্য-বিষয় তিনি ক্লাসে এমনভাবে আবৃত্তি করে যেতেন, যাতে করে তার বিষয়বস্তু বুঝতে আমাদের কষ্ট হত না। তার আবৃত্তির মধ্যেই তিনি যা বোঝাতে চাইতেন, তা পরিষ্কার ফুটে উঠত। আমরা তার পরে বই নিয়ে ঘরে বসে আলোচনা করতুম, নিজেরাই নিজেদের শিক্ষা দিতুম; পাঠ্যবিষয় বুঝতে আমাদের কোথাও কোন কষ্ট হত না। এমনিই ছিল তাঁর শিক্ষা দেবার ক্ষমতা বা পদ্ধতি। তিনি আর একটা করতেন—সপ্তাহের একটি বিশেষ নির্ধারিত দিনে ছেলেরা নাম না দিয়ে প্রবন্ধ বা কিছু লিখে তাঁর ডেস্কে লুকিয়ে রেখে আসত। তিনি বাড়ি গিয়ে পড়তেন ও একটি বিশেষ দিনে ক্লাসে সেই সব লেখার সমালোচনা করতেন। আমরা সবাই সেই দিনটির জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতুম। তিনি কখনো কারো লেখার সমালোচনা করতে গিয়ে কাউকে আঘাত করতেন না কারণ তাঁর মনে করুণা ছিল।" এই মর্লিই রবীন্দ্রনাথের একটি রচনার প্রশংসা করেন। এবং রচনাটি তিনি ডেস্কে লুকিয়ে রেখেছিলেন। বিষয় ছিল ইংরেজদের নিন্দা। রবীন্দ্রনাথের মনে ভয় ছিল, না জানি মর্লি কী বলেন। হঠাৎ একদিন বন্ধু লোকেন পালিত রবীন্দ্রনাথের পিঠ চাপড়ে বলেন, ওহে তোমার জয়জয়কার। হেনরি মর্লি তোমার প্রবন্ধের অজস্র প্রশংসা করলেন। কী তোমার বিষয়বস্তুর, কী তোমার লেখার ভঙ্গীর, কী তোমার ভাষার।" রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে পরে বলেছেন, "সেদিনের মতো এমন সত্যিকারের প্রশংসা জীবনে আমি পাইনি।"

কিন্তু এত সত্বেও তবু গ্র্যাজুয়েট হওয়া রবীন্দ্রনাথের কপালে ছিল না। ১৮৮১ সালে রবীন্দ্রনাথ আবার বিলেত যাত্রা করেন

ব্যারিস্টার হওয়ার জন্যে। কিন্তু এমনই কপাল, সেবার বিলেত যাওয়াই হল না। বিলেতের পথে মাদ্রাজ থেকেই ফিরে এলেন। ব্যারিস্টার হওয়াও জীবনে ঘটল না। ভাগ্যিস ঘটে নি, নইলে আমরা হয়ত আর একজন আশু চৌধুরী বা তারক পালিত পেতাম, আমাদের রবীন্দ্রনাথকে পেতাম না।

ছাত্র জীবনের এইখানেই ইতি। ভিত আগেভাগেই তৈরি, ধীরে ধীরে নির্মিত হতে থাকলো রবীন্দ্রপ্রতিভা সৌধ। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ হতে শুরু করলেন।

কবির স্বপ্নপ্রয়াণ



জীবনস্মৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য লেখেন, সারা জোড়াসাঁকোর বাড়ি স্বপ্নপ্রয়াণের পাতায় ছেয়ে গিয়েছিল।—"বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে, তেমনি স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই।" কবি ও কর্মী রবীন্দ্রনাথের জীবনও অনেকটা এই স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের মতো। জীবনভর তিনি বহু স্বপ্ন দেখেছেন ;—তার অনেকটাই বাস্তব হয়েছে, বাকিটা বসন্তের ঝরেপড়া আমের বোলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে অকালে। সাহিত্যের জন্য, দেশের জন্য, মানুষের জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ যে-স্বপ্ন দেখেছেন কর্মী রবীন্দ্রনাথ তাকে রূপ দিতে চেয়েছেন। বহুক্ষেত্রেই তা পারে নি। এই না-পারার বেদনা থেকেই জন্ম হয়েছে নতুন সৃষ্টির। স্বপ্নবিলাসী নন, তিনি ছিলেন স্বপ্নাভিসারী।

এই অভিসার তাঁর সারা জীবনের বিপুল কর্মকাণ্ডে এবং বাল্য থেকে বার্ধক্যের রচনায় প্রবাহিত। সেই কারণেই তাঁর অবিরাম যাওয়া-আসা ছিল অতীতে আর ভবিষ্যতে। আবার কখনো-কখনো অতীত আর ভবিষ্যতকে তিনি মেলাতে চেয়েছেন বর্তমানে এবং মেলাতে না-পারায় মাঝে মাঝে স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে গেছে।

স্বপ্ন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছু আলোচনাও করেছেন। রাণী চন্দকে

তিনি ১৯৪১ সালের ২৫ মে (প্রঃ আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ) মৃত্যুর কিছুদিন আগে বলেন—

"স্বপ্ন বলে একটা পদার্থ আছে, বরাবর মানুষ সেই স্বপ্নকে সার্থক করতে চেয়েছে। আমার হাতেই তা আছে যা পাইনি। শিল্পী তুলি নিয়ে বসল, আপন অন্তরের যা রূপ ফুটিয়ে তুলল। যা বিধাতা পারেননি, আমার হাতে ভার ছিল, তাই দেখিয়েছি। বাস্তবে আছে দারিদ্র্য দুঃখ অন্যায়, আছে মলিনতা। সেটার জায়গা হচ্ছে সমাজনীতিতে, সাহিত্যে নয়।······শিল্পের ক্ষেত্র আর কর্মের ক্ষেত্র আলাদা। মানুষের দুঃখমোচনে প্রাণপাত করেছেন যাঁরা তাঁরাতো শিল্পী নন, কবি নন; তাঁরা মহাপ্রাণ। মানুষের দুঃখ, মানুষের দারিদ্র্য ইনিয়ে বিনিয়ে কবিতা লিখে দূর করা যায় না— ত্রৈমাসিক বার্ষিকী বের করে দূর করা যায় না—চাই কাজ, কোমর বেঁধে কাজে লাগা চাই।···স্বপ্ন মানুষের যেখানে, সেখানে সে কবি; সেখানে সে সাহিত্যিক। সাহিত্য ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেছে। আমি যেখানে সাহিত্যিক সেখানে ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেছি। সে আমাকে স্পর্শ করেনি। আমি ইতিহাস উত্তীর্ণ হয়েছি বলেই আমি রবীন্দ্রনাথ। আমি একক বলেই আমি কবি।"

কিন্তু এতো গেল স্বপ্নের ভাবের দিক। আক্ষরিক অর্থেও স্বপ্ন ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার একটা অংশ জুড়ে রয়েছে। বারবার তিনি স্বপন পারের ডাক শুনেছেন, আহ্বান করেছেন স্বপ্ন-স্বরূপিণীকে, বিহ্বল রাতে পেয়েছেন মৃদুস্মিত স্বপ্নের আভাস, মায়ালোকের ছায়া তরণী ভাসিয়েছেন স্বপ্ন পারাবারে এবং দূর-রজনীর স্বপন নূতনের হাসিতে মিশিয়ে স্বর্গের কৌতুক-মেলায় স্বপ্নের সাথীর সঙ্গে মেতে উঠেছেন। তাঁর সারা জীবনের স্বপ্নের আয়োজন চলেছে বারবার এবং ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে বাণী ধ্বনিয়া উঠেছে স্বপ্নে। কারণ তিনি কেবলই স্বপন-বপন করেছেন এবং স্বপনতরীর নেয়েকে ডাক দিয়ে বলেছেন, আমি স্বপনে রয়েছি ভোর।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত কবিজীবনের শুরু নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ দিয়ে। আবার অন্তিমে শেষ লেখায় বলেছেন, জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের শুনিয়েছেন অমৃত সমান স্বপ্নমঙ্গলের কথা, হিং টিং ছট কবিতায়। কল্পনায় তিনি স্বপ্নে চলে গিয়েছেন দূরে বহু দূরে, উজ্জয়িনীতে এবং কলকাতার কিম্ভূতকিমাকার চেহারা-সম্পর্কে বলেছেন : একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছিনু। স্বপ্ন-সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যাও অনেক রকম। কখনো বলেছেন,

স্বপ্ন আমার জোনাকী
দীপ্ত প্রাণের মণিকা
স্তব্ধ আঁধার নিশীথে
উড়িছে আলোর পাখা :

কখনো বলেছেন,

ঘুমের আঁধার কোটরের তলে
স্বপ্ন পাখির বাসা
কুড়ায়ে এনেছে মুখর দিনের
খসে পড়া ভাঙা বাসা

এবং সর্বশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—

জগতে সকলি মিথ্যা সব মায়াময়
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।

কবিতায় ও গানে স্বপ্নের বাহুল্য যে-কোনো রবীন্দ্ররচনানুরাগীই আবিষ্কার করতে পারবেন। বিশেষ ক'রে প্রেমের গানে অঙ্গে-অঙ্গে স্বপ্নের বাঁশি বেজেছে। তাই তিনি বলেন, 'স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে' কিংবা 'আধেক ঘুমে নয়নচুমে স্বপন দিয়ে যায়।' কিন্তু সৃষ্টির দিক ছাড়াও ব্যক্তিগত জীবন নামক একটি বস্তু আছে। সেখানে প্রত্যেকে রক্তমাংসের মানুষ। চেতনার সঙ্গে মিশে আছে অবচেতন মন। বাস্তবের সঙ্গে মিশে আছে স্বপ্ন। এমন মানুষ কেউ নেই, যে কোনোদিন স্বপ্ন দেখেনি। আহার-নিদ্রাদির মতো স্বপ্ন প্রত্যেক

মানুষের জীবনের সঙ্গী। রবীন্দ্রনাথের বহু বিচিত্র দিকের পরিচয় আমরা পেয়েছি, কিন্তু তিনি কী স্বপ্ন দেখতেন, তার বিবরণ বিশেষ একটা পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের দেখা স্বপ্নের সন্ধানে ঘুরছি অনেকদিন। সন্ধানকার্য ব্যর্থ হয়নি। তাঁর চিঠিপত্র এবং অন্যের রবীন্দ্রস্মৃতি-কথায় কিছু স্বপ্নের হদিস মিলেছে। রবীন্দ্রনাথ এক অসাধারণ পুরুষ। তাঁর জীবনে যে-বৈশিষ্ট্য, তা তাঁর দেখা স্বপ্নেও থাকার কথা। এই স্বপ্ন থেকে এক নতুন রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাঁর মা প্রায় অনুপস্থিত। কিন্তু স্বপ্নে তিনি মাকে প্রায়ই দেখতেন। ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে শান্তিনিকেতনে মন্দিরে আচার্যের ভাষণে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গত একটি স্বপ্নের কথা বলেন। এই স্বপ্ন তাঁর মাকে নিয়ে। তিনি বলেন, "আমার একটি স্বপ্নের কথা বলি। আমি নিতান্ত বালককালে মাতৃহীন। আমার বড়ো বয়সের জীবনে মার অধিষ্ঠান ছিল না। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, আমি যেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি। গঙ্গার ধারের বাগান বাড়িতে মা একটি ঘরে বসে রয়েছেন। মা আছেন তো আছেন—তাঁর আবির্ভাব তো সকল সময়ে চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিয়ে তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে এক মুহূর্তে আমার হঠাৎ কী হল জানিনে—আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠল যে, মা আছেন। তখনই তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে বললেন, 'তুমি এসেছ!' এইখানেই স্বপ্ন ভেঙে গেল।"

১৮৯০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর, বিলেত যাওয়ার পথে ম্যাসালিয়া জাহাজ থেকে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে রবীন্দ্রনাথ যে-চিঠি লেখেন, তাতে এক স্বপ্নের উল্লেখ আছে। প্রথম সন্তান মাধুরীলতা—ডাক নাম বেলা। রবীন্দ্রনাথ আদর ক'রে ডাকেন বেলি। প্রবাসে

সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে এই বেলির কথা। সেইজন্যই তাঁকে তিনি স্বপ্নেও দেখেন। স্ত্রীকে তিনি লিখছেন—"কাল রাত্তিরে বেলিটাকে স্বপ্নে দেখেছিলুম। সে যেন স্টিমারে এসেছে। তাকে এমনি চমৎকার ভাল দেখাচ্ছে সে আর কী বলব। দেশে ফেরবার সময় বাচ্চাদের জন্যে কী রকম জিনিস নিয়ে যাব বল দেখি।"

স্ত্রীকে তিনি জানান আর একটি স্বপ্নের কথা। তাও চিঠিতে। ১৯০০ সালের ১৭ ডিসেম্বর কলকাতা থেকে শিলাইদহে লিখছেন—"কাল রাত্রে প্রায় সমস্ত রাত ধরে স্বপ্ন দেখেছি যে তুমি আমার উপরে রাগ ক'রে আছ এবং কী সব নিয়ে আমাকে বকছ। যখন স্বপ্ন বই নয় তখন সুস্বপ্ন দেখলেই হয়। সংসারে জাগ্রত অবস্থায় সত্যকার ঝঞ্ঝাট অনেক আছে। আবার মিথ্যাও যদি অলীক ঝঞ্ঝাট বহন করে আনে তাহলে আর তো পারা যায় না। সেই স্বপ্নের রেশ নিয়ে আজ সকালে মনটা কী রকম খারাপ হয়ে গেল।"

ছিন্নপত্রে ইন্দিরা দেবীচৌধুরীকে চিঠিতে তিনি এক স্বপ্নের কথা বলেছেন। ১৯১১ সালের জুন মাসে সাজাদপুর থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"কাল রাত্তিরে ভারী একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলুম। সমস্ত কলকাতা শহরটা যেন মহা একটা ভীষণ অথচ আশ্চর্য ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বাড়িঘর সমস্তই একটা অন্ধকার কালো কুয়াশার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে এবং তার ভিতর তুমুল কী একটা কাণ্ড চলছে। আমি একটা ভাড়াটে গাড়ি ক'রে পার্ক স্ট্রীটের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। যেতে যেতে দেখলুম সেন্ট জেবিয়ার কলেজটা দেখতে দেখতে হু-হু করে বেড়ে উঠছে। সেই অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে অসম্ভব উঁচু হয়ে উঠছে। তারপরে ক্রমে জানতে পারলুম একদল অদ্ভুত লোক এসেছে, তারা টাকা পেলে কী এক কৌশলে এই রকম অপূর্ব ব্যাপার করতে পারে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি এসে দেখি সেখানেও তারা এসেছে। বদ দেখতে, কতকটা মোঙ্গোলিয়ান ধাঁচের চেহারা। সরু গোঁফ, গোটা দশ-বারো দাড়ি মুখের এদিকে-ওদিকে

খোঁচা খোঁচা রকম বেরিয়েছে। তারা মানুষকেও বড়ো ক'রে দিতে পারে। তাই আমাদের দেউড়িতে আমাদের বাড়ির সব মেয়েরা লম্বা হবার জন্যে উমেদার হয়েছেন। তাঁরা এঁদের মাথায় কী একটা গুঁড়ো দিচ্ছে আর এঁরা হুশ করে লম্বা হয়ে উঠছেন। আমি কেবলই বলছি, কী আশ্চর্যি, এ যেন ঠিক স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। তারপরে কে একজন প্রস্তাব করলে আমাদের বাড়িটা উঁচু করে দিতে। তারা রাজি হয়ে কতকটা ভাঙতে আরম্ভ করলে। খানিকটা ভেঙেচুরে বললে, এইবার এত টাকা চাই, নইলে বাড়িতে হাত দেব না। কুঞ্জ সরকার বললে, সে কি হয়, কাজ না হলে কী করে টাকা দেওয়া যায়! বলতেই তারা চটে উঠল। বাড়িটা সমস্তই একরকম বেঁকেচুরে বিশ্রী হয়ে গেল এবং মাঝে মাঝে দেখা গেল, আধখানা মানুষ দেয়ালের মধ্যে গাঁথা রয়েছে, আধখানা বেরিয়ে। সমস্ত দেখেশুনে মনে হল এসব শয়তানী কাণ্ড। বড়োদাদাকে বললুম, 'বড়দা দেখছেন ব্যাপারটা! আসুন একবার উপাসনা করা যাক।' দালানে গিয়ে খুব একাগ্র মনে উপাসনা করা গেল। বেরিয়ে এসে মনে করলুম ঈশ্বরের নাম করে তাদের ভর্ৎসনা করব। কিন্তু বুক ফেটে যেতে লাগল, তবু গলা দিয়ে কথা বেরোল না। তারপর কখন জেগে উঠলুম ঠিক মনে পড়ছে না। ভারী অদ্ভুত স্বপ্ন, না? সমস্ত কলকাতা শহরে শয়তানের প্রাদুর্ভাব— সবাই তার সাহায্যে বেড়ে ওঠবার চেষ্টা করছে। একটা অন্ধকার নারকী কুজ্‌ঝটিকার মধ্যে সমস্ত শহরের ভয়ঙ্কর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে একটু পরিহাসও ছিল। এত দেশ থাকতে জেসুয়িটদের ইস্কুলটার উপরেই শয়তানের এত অনুগ্রহ কেন?"

১৯১২ সালে আমেরিকার আর্বানা থেকে রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে এক চিঠি লেখেন। তাতেও একটি স্বপ্নের কথা আছে। ইন্দিরা দেবীকে লেখা স্বপ্নের মতো উদ্ভট নয়। একেবারে বিপরীত মধুর স্বপ্ন। সেদিনটা ছিল সাতই পৌষ। দূর আমেরিকায় থেকে

নিশ্চয়ই তাঁর বারবার মনে পড়ছিল শান্তিনিকেতনের কথা, সাতই পৌষের সকালের মন্দিরের কথা। তাই ছয়ই পৌষ রাত্রে তিনি স্বপ্নে চলে যান শান্তিনিকেতন। সেদিন তিনি ছিলেন অসুস্থ। পেটে অসহ্য ব্যথা। সেই ব্যথা নিয়ে রাত্রে ঘুমোতে গেলেন। পাশের ঘরে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। সাতই পৌষ ভোরে ঘুম থেকে জেগে অজিত চক্রবর্তীকে তিনি জানান স্বপ্নটির কথা—"কাল রাত্রে ঘুম থেকে প্রায় মাঝে মাঝে জেগে উঠে ব্যথা বোধ করছিলুম। স্বপ্ন দেখলুম তোমাদের সকালকার উৎসব আরম্ভ হয়েছে। আমি যেন এখান থেকে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছি, কিন্তু কেউ জানে না। তুমি তখন গান গাচ্ছ, 'জাগো সকল অমৃতের অধিকারী।' আমি মন্দিরের উত্তরের বারান্দা দিয়ে আস্তে আস্তে ছায়ার মত যাচ্ছি। তোমাদের পিছনে গিয়ে বসব। তোমরা কেউ কেউ টের পেয়ে আশ্চর্য হয়ে উঠেছ। এমনতর সুস্পষ্ট স্বপ্ন আমি অনেকদিন দেখিনি। জেগে উঠে ঐ গানটা আমার মনে স্পষ্ট বাজতে লাগল। হায়রে, এদেশে কি তেমন সকাল হয় না? সেই অমৃতের অধিকারের মধ্যে জেগে উঠবার গান এখানকার আকাশে কি ঠিক সুরে বেজে উঠতে চায় না?···সেই স্বপ্নে যখন ভোরের রাগিণীতে শুনলুম 'জাগো সকল অমৃতের অধিকারী', তখন আমার মনে হল আমি যেন একেবারে সমুদ্রের তলায় তলিয়ে গেছি। ডাঙা থেকে আমার ডাক আসছে—সেই ডাঙা যেখানে সূর্যের আলো আকাশভরা যেখানে মাঠ মিশে গেছে নীলের কোলে, যেখানে পুজোর ফুল ফুটে ঝরে পড়ছে, যেখানে উদাস হাওয়া খ্যাপার মত বনে বনে একতারা বাজিয়ে চলেছে, যেখানে মাটি কোলে টানে, জল বুকে করে নেয়, বাতাস গায়ে হাত বুলোয় আকাশ কপালে চুমো খায়—সমস্ত যেখানে বুকের কাছাকাছি—জগৎ যেখানে বন্ধুর মত গলাগলি করে।"

১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ইন্দোনেশিয়ায়। ১১ সেপ্টেম্বর বালি দ্বীপ থেকে পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে এক চিঠিতে জানাচ্ছেন—"সেদিন

বালিতে থাকতে থাকতে ভোর রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখলুম। যেন জোড়াসাঁকোর বারান্দায় রথী গম্ভীর মুখে আমাকে এককোণে ডেকে নিয়ে বললেন, ভাবনার বিশেষ কোন কারণ নেই। কিন্তু ডাক্তারের মতে তোমার অসুখটা ক্রনিক ইনফ্লুয়েঞ্জা। শিলাইদহে তোমাকে নিয়ে আমি যদি বোটে কাটিয়ে আসতে পারি, তাহলে তোমার উপকার হবে। আমি বললুম, নিশ্চয় নিয়ে যাব। বলে ডাক্তারের সঙ্গে কর্তব্য আলোচনা করতে লাগলুম। ডাক্তারটি বাঙালী। কিন্তু তাকে চিনি নে। জেগে উঠে মনটা বড়ো উদ্বিগ্ন হল। হিসাব করে দেখলুম এটা ভাদ্র মাস, এই সময়েই তোমার হাঁপানি বাড়বার কথা। মনে হল তোমার হয়ত হাঁপানি এবার বেশি প্রবল হয়েছে, তাই এই রকম স্বপ্ন দেখলুম। যাই হোক এখন তো কিছু করবার নেই। ভাবছি ফিরে গিয়ে সত্যিই তোমাকে কিছুদিন পদ্মাচরের হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আসব। আমার বিশ্বাস তোমার তাতে উপকার হবে।"

আর একটি স্বপ্ন। সাজাদপুরে দেখা। ১৮৯২ সালের ২ জুলাইয়ের। পরদিন তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন—"কাল রাত্তিরে আমি বেশ একটা নতুন রকমের স্বপ্ন দেখেছি। যেন কোথায় এক জায়গায় লেফটেনেণ্ট গবর্নর এসেছে এবং তার অভ্যর্থনা উপলক্ষে উৎসব হচ্ছে। অন্যান্য নানারকম আমোদের মধ্যে একটা তাম্বুতে একজন বিখ্যাত বুড়ো গাইয়ে গান গাচ্ছে। আমি সে তাম্বুর ভিতরে বসে নেই কিন্তু বাইরে থেকে সমস্ত শুনতে পাচ্ছি। গাইয়েটা একটা বড়োরকম ইমনকল্যাণ গাইছিল। গাইতে গাইতে হঠাৎ এক জায়গায় সে ভুলে গেল। দুবার সেটা ফিরে মনে করবার চেষ্টা করলে—তারপর তৃতীয় বারের বার নিরাশ হয়ে তার কথাগুলো ছেড়ে দিয়ে অমনি কেবল সুরটা ভেঁজে যেতে যেতে হঠাৎ তার সুরটা কেমন করে কান্নায় পরিবর্তিত হয়ে গেল। সবাই মনে করছিল সে গান গাচ্ছে, হঠাৎ দেখলে সে কান্না। তার কান্না শুনে বড়দাদা 'আহা

আহা' করে উঠলেন। একজন প্রকৃত আর্টিস্টের মনে এ রকম ঘটনায় কতখানি আঘাত লাগতে পারে তিনি যেন সেটা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। বাইরে থেকে তার সেই আন্তরিক শোকের স্বর শুনে আমারও ভারী কষ্ট হতে লাগল। পাছে শ্রোতাদের মধ্যে এমন ঢের লোক থাকে যারা এই গায়কের হঠাৎ এই শোকোচ্ছ্বাস ভারী অদ্ভুত বলে মনে করে, এর যথার্থ মর্মটুকু না বুঝতে পেরে লোকটার উপর আধা বিরক্তি আধা পরিহাস প্রকাশ করে, আমার ইচ্ছে করছিল কোনো রকমে তাকে আড়াল করে রাখতে। তার পরে নানারকম অসংলগ্ন হিজিবিজি কী হল এবং বাংলা মুল্লুকের লেফটেনেণ্ট গবর্নর যে কোথায় উড়ে গেল তার কিছুই মনে নেই।"

রাণী চন্দের আলাপচারি রবীন্দ্রনাথে ১৯৪১ সালের ৫জুন রবীন্দ্রনাথ অদ্ভুত এক স্বপ্নের কথা বলেছেন।—"কাল রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলুম। সূর্যলোকে ঝড় উঠেছে। সে অবর্ণনীয়। দাউ দাউ করে চারদিকে লেলিহান অগ্নিশিখা। গেলুম গেলুম রব। একটা যেন প্রলয কাণ্ড, সব পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নরকের এমন একটা বীভৎস রূপ, সে কল্পনায়ও দেখা যায় না। হয়ত সেদিন শীগগীরই আসছে। আমি আগে থাকতেই দেখে নিলুম।"

আর একটি স্বপ্নের বিবরণ দিয়েছেন রাণী চন্দ। আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ বইয়ে। ১৯৪১ সালের ২৮শে মে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"কাল একটা র‍্যাশনাল স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু ভুলে গেছি সব—কী যেন কার ছেলে মারা গেছে—মানত করেছে দেবতার কাছে—যদি দয়া করে ইত্যাদি। আমি বললুম, কেন এই সব হাতজোড় করে দেবতার উপর ভক্তি দেখিয়ে তাঁকে অপমান করো। প্রকৃতির নিয়ম সব। 'দেবতা' 'দেবতা' বলে চিৎকার করা হয় বৃথা, তারা নিস্পৃহ। মানুষের দুঃখ মানুষই দূর করতে পারে—এই সব বলে যাচ্ছি। কিন্তু কেউ শুনলে না। রাত্রিবেলা নাস্তিকতা করার সুবিধে আছে।"

নয়টি স্বপ্ন উপহার দেওয়া হ'ল। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, আশী বছরের জীবনে তিনি ওই ক'টি মাত্র স্বপ্ন দেখেছেন। নিশ্চই তালিকা বৃহৎ, কিন্তু তার রেকর্ড নেই, যে-নয়টি স্বপ্ন উল্লেখ করা হ'ল নয়টিই বিচিত্র ধরণের। কোনোটি উদ্ভট—অর্থ তার ভাবি ভাবি গবুচন্দ্র চুপ। মজার ব্যাপার এই, উল্লেখিত দুটি উদ্ভট স্বপ্নে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ উপস্থিত। কোনোটি আবার বড় মধুর। যেমন মায়ের স্বপ্ন। যেমন সাতই পৌষের স্বপ্ন।

এখন প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ এই সব স্বপ্নকে কোনো গুরুত্ব দিতেন কিনা। দিতেন। তার প্রমাণ আছে। ১৯২৭ সালে বালীদ্বীপ থেকে প্রতিমা দেবীকে এক স্বপ্নের কথা লিখেছিলেন। তারই জের টেনে ১৯৩৬ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখেন, "রথী, বৌমার জন্যে এতদিন আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল। তোর চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। মনে পড়ল অনেক দিন আগে স্বপ্নে দেখেছিলুম, কে একজন বললে, ওঁর ব্যামো হচ্ছে ক্রনিক ইনফ্লুয়েঞ্জা, পদ্মার চরে গিয়ে থাকলে সেরে যাবে। স্বপ্নটাকে পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কী।"

স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথকে আরো নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। কিছু কাহিনীও তিনি পেয়েছেন স্বপ্নে। যেমন রাজর্ষি। বইয়ের সূচনায় তিনি বলেছেন, "এ আমার স্বপ্নলব্ধ উপন্যাস।" স্বপ্নটা এই রকম —"রাজনারায়ণবাবু ছিলেন দেওঘরে। তাঁকে দেখতে যাব বলে বেরোনো গেল। রাত্রে গাড়ির আলোটা বিশ্রামের ব্যাঘাত করবে বলে তার নিচেকার আবরণটা টেনে দিলুম। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সহযাত্রীর মন তাতে প্রসন্ন হল না। ঢাকা খুলে দিলেন। জাগা অনিবার্য ভেবে একটা গল্পের প্লট মনে আনতে চেষ্টা করলুম। ঘুম এসে গেল। স্বপ্নে দেখলুম, একটা পাথরের মন্দির। ছোট মেয়েকে নিয়ে বাপ এসেছেন পুজো দিতে। সাদা পাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে বলির রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দেখে মেয়েটির মুখে কী ভয়। কী বেদনা! বাপকে সে বারবার করুণস্বরে বলতে লাগল, 'বাবা এত

রক্ত কেন!' বাপ কোনমতে মেয়ের মুখ চাপা দিতে চায়। মেয়ে তখন নিজের আঁচল দিয়ে রক্ত মুছতে লাগল। জেগে উঠেই বললুম, গল্প পাওয়া গেল।"

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গল্প 'দেবী'। প্রভাতকুমার নিজেই বলেছেন, তার আখ্যানভাগ তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছেন এবং গল্পটি রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নে পান। প্রভাতকুমার প্রমুখ কয়েকজন শিষ্যবন্ধুর কাছে তিনি স্বপ্নে-পাওয়া ওই কাহিনীর কথা বলেন। শোনামাত্র কাহিনীটি প্রভাতকুমার নিজে লিখবেন ব'লে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

স্বপ্নে-পাওয়া গল্প রবীন্দ্রনাথের আরো আছে। জীবনস্মৃতি গ্রন্থে তিনি নিজেই রাজর্ষি-প্রসঙ্গে বলেছেন—"স্বপ্নে-পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে।"

বিপ্লবের কবি



রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্য, এখনো তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তিনি নাকি যথেষ্ট পরিমাণ স্বদেশসেবা করেন নি, তিনি নাকি স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে বিশ্ব-মৈত্রীর জয়ঢাক পিটিয়েছেন, তিনি নাকি দেশপ্রেমের বাণী দিয়ে বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনা সম্পর্কে অপরিচিত ব্যক্তিদের মুখেই এমন অসত্য উক্তি শোভা পায়। আপন মনের মাধুরী মিশিয়েই তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে রচনা করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের আরো দুর্ভাগ্য, জন্মসূত্রে ধনীর সন্তান বলে তিনি বুর্জোয়া কবি হিসাবেই চিহ্নিত রইলেন একালের বিপ্লবীদের কাছে। যাঁরা তাঁর মূর্তির শিরশ্ছেদ এবং রবীন্দ্র-রচনাবলীর বহ্ন্যুৎসব করেন, তাঁরা একটিবার ওই ছিন্ন দগ্ধ রচনায় কিয়দংশ স্থিরবুদ্ধিতে পড়ে দেখলে জানতে পারতেন তাঁদেরই মনের কথা রবীন্দ্রনাথ নামক ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা কবি কত স্পষ্টভাষায় বলে গিয়েছেন। আর কেউ নয়, 'দিনবদলের পালার' জয়গান তাঁর মুখেই শোনা গিয়েছে প্রথম, তিনিই তো দামামা বাজিয়েছেন বিপ্লবের মশাল হাতে নিয়ে। স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত হানা জরদ্গব সমাজের শিরায় শিরায় আগুন ধরিয়ে নতুন সমাজ গড়ার কথা এখনো তো কোন সাহিত্যিক তাঁর মত বলতে

পারেন নি। বাঁধ ভেঙে দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের শুকনো গাঙে জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক আনতে তিনিই ধ্বনি দিয়েছেন উচ্চকণ্ঠে, আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন সেই মন্ত্র—'ভাঙনের জয়গান গাও।' ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালার নির্দেশও তো তাঁর।

অথচ কিছু বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থ এবং সঞ্চয়িতা-গীতবিতানের মধ্যে আবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে অপরিচিতই থেকে গেলেন। রবীন্দ্র-রচনাবলীর রাজপ্রাসাদে আমাদের প্রবেশ খিড়কি দুয়ার দিয়ে, সম্মুখের সিংহদ্বারগুলি যেন অর্গলবদ্ধ। অনর্গল হলেও সাধারণত সেদিকে আমরা প্রবেশের চেষ্টা করি না। ফলে ওই সুবিশাল সুবিন্যস্ত রাজপুরীর খণ্ডমাত্র দেখে তার সম্পর্কে ধারণা করে বসি। আমরা না পড়ি তাঁর শেষবেলাকার কবিতা, না পড়ি প্রবন্ধ, না পড়ি তাৎপর্যপূর্ণ সব নাটক। ভগবান, প্রকৃতি আর যৎকিঞ্চিৎ প্রেমে মাখা কিছু কবিতা আর গান এবং কথা ও কাহিনী বেশির ভাগ পাঠকের রবীন্দ্র-চর্চার সম্বল। এই খণ্ডচিত্র একালের কবি-মনীষীর স্বরূপ উদ্ধারে বরাবর বাধার সৃষ্টি করে এসেছে। সোনার তরী কল্পনা খেয়া গীতাঞ্জলি বলাকার কবি শেষ জীবনে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হয়ে হতাশায় ও বিক্ষোভে কীভাবে জর্জরিত হয়েছেন, তার খবর আমরা রাখি না। রবীন্দ্রনাথের বাইরে ঋষিপ্রতিম সৌম্য মূর্তিটাই আমরা কেবল দেখছি, তাঁর বিপ্লবী দৃপ্তমূর্তি আজো অপ্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব নাটকেই থাকেন একজন সদানন্দময় পুরুষ—যিনি কখনো ঠাকুরদা, কখনো দাদাঠাকুর, কখনো ধনঞ্জয় বৈরাগী। তাঁদের হাতে বাউলের একতারা থাকলে কী হবে, আলখাল্লার ভিতর লুকিয়ে থাকে তরবারি। এই সব চরিত্রে সর্বদা অভিনয় করেছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। মুক্তধারা বা পরিত্রাণে ধনঞ্জয় বৈরাগী আইন অমান্যের নেতৃত্ব দেন এবং অচলায়তনে দাদা-

ঠাকুর উপস্থিত হন যোদ্ধার বেশে। তাঁর সঙ্গীরাও অস্ত্রধারী। তাঁরা মন্ত্রহীন কর্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছ দল। ব্রাহ্মণ উপাচার্যদের গুরু এই দাদাঠাকুর অন্ত্যজ দর্ভকদের গোসাঁই। তিনি অচলায়তনের দেয়াল ভেঙে চুরমার করে দিয়ে নতুন সৌধ গড়েন। লাল পতাকা ওড়ে তাঁর হাতে। ফাল্গুনী নাটকে নবযৌবনের চিৎকার করে বলে,

'জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে সকল অনাসৃষ্টি,
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি,
রইল শনির দৃষ্টি।'

তাদের খেলা বড় অদ্ভুত, তারা বলে, 'খেলা মোদের লড়াই করা, খেলা মোদের বাঁচা মরা' এবং তাদের যে সর্দার তাঁর আচার-আচরণ সুখী নিশ্চিন্ত সমাজের পক্ষে ভয়ানক। তিনি বলেন 'আমি কিছুরই নিষ্পত্তি করি নে। সঙ্কট থেকে সঙ্কটে নিয়ে চলি এই আমার সর্দারি।'

একালের কিছু রাজনৈতিক নেতা যখন আমাদের সঙ্কট থেকে সঙ্কটে নিয়ে যান, তখন আমরা শঙ্কিত হই, কিন্তু নবযৌবনের দলের সর্দারকে সমস্যা নিষ্পত্তির ভার না নিলেও যে চলে, একথা রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই বলে গিয়েছেন। কোন মার্কামারা ইজমের চর্চা না করেও 'বাঁশরি' নাটকে রবীন্দ্রনাথ পিনাকে টঙ্কার লাগান এবং বলতে পারেন 'লণ্ডভণ্ড লুটিল ধূলায় অভ্রভেদী অহঙ্কার।' তাসের দেশ নাটকে রবীন্দ্রনাথ শুনিয়েছেন 'অশান্তি মন্ত্র' এবং জীর্ণ পুরাতনকে বন্যার জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন। বাধ্যতামূলক আইনের বিরুদ্ধে জেহাদ ওই তাসের দেশ নাটকেই. 'চলবেনা চলবেনা' স্লোগানও ওই নাটকেই প্রথম। জড় পুরাতনকে চুরমার করার সঞ্জীবনী মন্ত্র শুনিয়েছেন তাসের দেশে আসা রাজপুত্র। রবীন্দ্রনাথ সেই সব বিদ্রোহী বিপ্লবীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন যাঁরা কায়েমী স্বার্থের দুর্গ ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর।

তাই তিনি তপোভঙ্গ কবিতায় বলেন—

বিদ্রোহী নবীন বীর
স্থবিরের শাসন-নাশন,
বারে বারে দেখা দিবে,—
আমি রচি তারি সিংহাসন,
তারি সম্ভাষণ।

যাঁরা বঞ্চিত, যাঁরা অত্যাচারিত, তাদের জন্যে শুধু দু ফোঁটা চোখের জল ফেলেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হননি, তিনি তাদের হাতেই নেতৃত্ব দেবার কথা বার বার বলে গিয়েছেন। 'রথের রশি' নাটকে জগন্নাথের রথ চলেনি ব্রাহ্মণ পুরোহিতের টানে, চলেনি ক্ষত্রিয় রাজার টানে, চলেনি বৈশ্য শ্রেষ্ঠীর টানে। অবশেষে চলল ব্রাত্য অন্ত্যজ শূদ্রদের সম্মিলিত শক্তিতে। এই জগৎ চালনার ভার এখন তাদের হাতেই। কিন্তু কায়েমী স্বার্থ এবং রক্ষণশীলতার প্রতিনিধিরা তাতে বিস্মিত। সত্যদ্রষ্টা কবি এসে বলেন, ঠিকই হয়েছে, যার পরে ভর দিয়ে চলছে এই জগৎ সংসার, যারা বলরামের চেলা, তাদের কব্জির জোরেই তো গতি আসবে। তারপর—

একদিন ওরা ভাববে
রথী কেউ নেই,
রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো, কাল থেকেই
শুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল
লাঙল চরকা তাঁতের—

শূদ্র অন্ত্যজদের হাতে দ্রুত ছুটে চলা রথটি দেখে পুরোহিতরা বিস্মিত। শঙ্কিতও। যদি কোন দুর্দৈব ঘটে, যদি আগুন লাগে।

কবি তখন বলেন—

যুগাবসানে লাগেই তো আগুন
যা ছাই হবার তাই ছাই হয়,
যা টিকে যায় তাই নিয়ে
সৃষ্টি হয় নবযুগের।

যুগাবসানের প্রলয়ঙ্কর দিকটা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ অবহিত। পুরাতনকে আগুনে পুড়িয়ে দিতে কিংবা জলে ভাসিয়ে দিতে তিনি পরাঙ্মুখ নন। তাই বলেন:

হঠাৎ অপমৃত্যুর সংকেতে
নূতন ফসল চাষের ঘরে
আনবে নূতন খেতে
শেষ পরীক্ষা ঘটাবে দুর্দৈবে—
জীর্ণ যুগের সঞ্চয়েতে
কী যাবে কী রইবে।

তবে রবীন্দ্রনাথ অগ্রবর্তী অন্য জায়গায়। তরুণ জনগণের হাতে ক্ষমতা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত নন। কেননা তিনি জানেন, নূতন পাওয়া ক্ষমতার অপব্যবহার অসম্ভব নয়। হঠাৎ হাতে আসা স্বাধীনতাকে তাই বাঁধতে হয় সংযমের শাসনে। বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায় গঠন। তখন হতে হয় স্থিতধী। সেই কারণেই অচলায়তন নাটকে দাদাঠাকুর ছটফটে শোন-পাংশুদের বসতে শেখাতে চান, বলেন, 'ওরা স্বাধীনতাকে বাইরে থেকে ভারি একটা মজার জিনিস বলে জানে। কিন্তু জানে না স্থির হয়ে বসে তার ভিতর থেকে সার পদার্থটা বের করে নিতে হয়।' এবং সবশেষে বিপ্লবের রক্ত পতাকা আকাশে ওড়ানোর পর দাদাঠাকুরের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'এবার আর লাল নয়, এবার একেবারে শুভ্র। নতুন সৌধের শাদা ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও। মেলো তোমরা দুই দলে। লাগো তোমাদের কাজে।'

ভাঙনের পর গঠন। কাজ। নইলে বিপ্লব কিসের? তাই 'রথের রশি' নাটকে কবি বলেন, শূদ্রদের হাতে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে চলা রথ নতুন পাওয়া স্বাধীনতার আনন্দে উদ্দাম। এই বিপ্লবী গতিকে সংহত না করলে পরে বিপদের আশঙ্কা থাকে। তখনই প্রয়োজন কবির। কবি মানেন ছন্দ। ছন্দ মানেই শৃঙ্খলা। হলধরের মাতলামিতে জগতটা যাতে টলমলিয়ে না যায়, তার জন্যে ডাকতে হয় কবিকে। কবি বলেন—'গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে। আমরা মানি ছন্দ, জানি একঝোঁকা হলেই তাল কাটে।' তারপর?

তারপর কোন এক যুগে
কোন একদিন
আসবে উল্টো রথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের
উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।

এই বোঝাপড়া চলছে যুগে যুগে। যুগাবসান হয় বিপ্লবে। সেই বিপ্লবের ধ্বজা তুলে ধরে নির্মম নির্ভীক তরুণের দল। যিনি সত্যদ্রষ্টা, যিনি অপমানিতের বঞ্চিতের সমব্যথী, একমাত্র তিনিই সহজ মনে সত্যকে স্বীকার করে নেন। যেমন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি নূতন যুগের ভোর দূর থেকেই দেখেছিলেন, জেনেছিলেন একদিন না একদিন হাজার কণ্ঠের ধ্বনিনির্ঝরে ঘোষিত হবে ইহলোক জয়ের সংকল্প এবং তখন দেখা যাবে 'মৃত্যু বিপদকে তুচ্ছ করেছে সকলের সম্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ।'

মৃত্যুর নিপুণ শিল্পে



শৈশব থেকে বার্ধক্য—শোক রবীন্দ্রনাথের সদা-সহচর। নিজে ছিলেন দীর্ঘায়ু কিন্তু একের পর এক মৃত্যু তাঁর সারা জীবনে ছায়া ফেলেছে। সেই জন্যেই তাঁর রচনাবলীতে মৃত্যু নিয়ে এতো কবিতা এতো গান। বিদায় নেবার আগে দুঃখের আঁধার রাত্রি বারেবারে আসা সত্বেও নিজের জীবনে তিনি দেখেছেন মৃত্যুর নিপুণ শিল্প আঁধারে বিকীর্ণ। শোকের আঘাত কবির সৃষ্টিকে দিয়েছে নতুন মহিমা, তাঁকে শিখিয়েছে মৃত্যুঞ্জয় হওয়ার মহামন্ত্র। তাই একমাত্র তিনিই অনায়াসে বলতে পারেন, 'দুখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে, যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করিয়া ধরিব হে।'

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন তিন, মারা যান তাঁর ছোট ভাই বুধেন্দ্রনাথ। কিন্তু সে শোকের স্মৃতির কোন উল্লেখ নেই। জননী সারদাদেবীর মৃত্যুকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স চৌদ্দ। সেই দুঃখের দিনটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম, তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না।' সেই তাঁর প্রথম বড় আঘাত এবং এই আঘাতের জের চলল জীবনজুড়ে।

তাঁর বিয়ের দিনেই মারা গেলেন বড় ভগ্নিপতি সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি থাকতেন শ্বশুরালয় ঠাকুরবাড়িতেই। বিয়ের কয়েক মাস পরেই তেইশ চব্বিশ বছর বয়সে মৃত্যুর সঙ্গে হল স্থায়ী পরিচয়। নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করলেন এবং রবীন্দ্রনাথ হলেন উদ্‌ভ্রান্ত। পত্নী মৃণালিনী দেবী বিদায় নিলেন যখন কবির বয়স একচল্লিশ। দ্বিতীয় কন্যা রেণুকার মৃত্যু পরের বছর। ১৯০৫ সালে পিতৃদেব মহর্ষির মহাপ্রয়াণ। ১৯০৭ সালে প্রাণাধিক কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু। তারপরও চলেছে প্রিয়জনের মৃত্যুর মিছিল। জ্যেষ্ঠাকন্যা মাধুরীলতা, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ, নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ। পুত্রোপম ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে। সর্বশেষে নিজের মৃত্যুর ঠিক এক বছর আগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আর এক প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ। ১৯৩২ সালে আর এক বাইশে শ্রাবণে বিদেশে মৃত্যু ঘটে এক মাত্র দৌহিত্র নীতিন্দ্রনাথের।

কিন্তু এতো গেল পারিবারিক শোক। বাইরে আরো অনেক মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের জীবনকে নাড়া দিয়ে গেছে। কত বন্ধুবান্ধব' কত প্রিয়জন। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও শিষ্যদের মধ্যে কবির জীবদ্দশাতেই মারা যান শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, লোকেন পালিত, প্রিয়নাথ সেন, জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন দত্ত, সতীশ রায়, অজিত চক্রবর্তী, কালীমোহন ঘোষ এণ্ড্রুজ পিয়ার্সন, সন্তোষ মজুমদার, সুকুমার রায়। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, অনাত্মীয় কয়েকজন গুণগ্রাহীর শেষ শয্যার শিয়রে গিয়েও তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছে জীবনের নানা সময়ে। মৃত্যুর পূর্বে শেষ দর্শনের ইচ্ছা পূরণ করতে বারবার অনাত্মীয় মুমূর্ষুর কাছে যেতে হয়েছে পৃথিবীতে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকেই। ব্যক্তিগত শোকের উপর সহ্য করতে হয়েছে অন্য শোক। মৃত্যুকালে পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, স্ত্রী বা অন্য কোন প্রিয়জনকে

দেখতে চাওয়ার ঘটনা রয়েছে প্রায় প্রতি পরিবারেই, কিন্তু পিতা নয়, পুত্র নয়, এমনকি কুলগুরুও নয়, সাহিত্য-গুরু রবীন্দ্রনাথকে দেখতে চাওয়ার মধ্যে অসাধারণত্ব আছে। মৃত্যুকালে কবি দর্শন-প্রার্থী এই রকম তিনজন বিখ্যাত বাঙালী আছেন। —রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুকুমার রায় ও রজনীকান্ত সেন।

অবশ্য তার আগে বিলাতে সম্পূর্ণ এক অপরিচিতার রোগশয্যায় শোকবিলাপের এক 'প্রহসন' করতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। সতেরো বছর বয়সে প্রথমবার বিলাতে থাকার সময় ভারতের এক ইংরেজ রাজকর্মচারীর বিধবা স্ত্রীকে একটি ইংরেজি বিলাপ গান বেহাগ রাগে অনবরত শোনাতে হত। বেহাগ রাগের সংযোজন স্বামীশোকাতুরার পরামর্শেই। নিতান্ত ভালো মানুষের মতো রবীন্দ্রনাথ ভদ্রমহিলার অনুরোধ রক্ষা করেন। তবে এটাই শেষ নয়। একদিন ওই মহিলাটির জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে শহরতলিতে তাঁর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ যেতে বাধ্য হন। সেই রাত্রি নানা দুর্ভোগে ওই বাড়িতে কাটানোর পর সকালবেলা ভদ্রমহিলা সেই বেহাগ রাগের ইংরেজি বিলাপ আর একজন মৃত্যুপথযাত্রিণীকে শোনানোর জন্যে রবীন্দ্রনাথকে নির্দেশ দেন। রবীন্দ্রনাথ ভালোমানুষের মতো নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হলেন এই অতিরিক্ত আবদারে। জীবনস্মৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে লিখছেন—আহারান্তে নিমন্ত্রণকর্ত্রী কহিলেন, 'যাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি তিনি অসুস্থ, শয্যাগত। তাঁহার শয়নগৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া তোমাকে গাহিতে হইবে।' সিঁড়ির উপর আমাকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল। রুদ্ধদ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া গৃহিণী কহিলেন, 'ওই ঘরে তিনি আছেন।" আমি সেই অদৃশ্য রহস্যের অভিমুখে দাঁড়াইয়া শোকের গান বেহাগ রাগিণীতে গাহিলাম। তাহার পর রোগিণীর কী অবস্থা হইল, সে সংবাদ লোকমুখে বা সংবাদপত্রে জানিতে পারি নাই।

এতো গেল পরিহাসের দিক। অন্য তিনজনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ছিল পরম সান্ত্বনার। ১৯১০ সালে কবি রজনীকান্ত সেন দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। মৃত্যু যখন অবধারিত ও আশু হয়ে উঠল, তাঁর বাসনা হল রবীন্দ্রনাথকে দেখবার। রবীন্দ্রনাথ সে সংবাদ পেয়েই হাসপাতালে ছুটে যান কান্তকবিকে দেখতে। রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে রোগের যন্ত্রণায় কাতর রজনীকান্ত আনন্দে অধীর হয়ে ওঠেন এবং তাঁর প্রিয় বই 'রাজা ও রাণী' নাটক থেকে ক্ষীণকণ্ঠে পড়ে শোনান একটি অংশ—

………এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য যত দুর্গ যত কারাগার
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে নাকি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়।

রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তকে আশীর্বাদ করেন। সেই আশীর্বাদে রোগীর যন্ত্রণা কমে যায়। বড় তৃপ্ত হন রজনীকান্ত। তাঁর শেষ-বেলাকার ডাকে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে দ্রুত সাড়া দেবেন তিনি ভাবতেই পারেননি। প্রণামের পর রবীন্দ্রনাথ বিদায় নিতেই তিনি লেখেন একটি গান—

আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ,
গর্ব করিতে চুর।'

গানটি তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনে ফিরেই রজনীকান্তকে এক দীর্ঘ চিঠি দেন। তিনি বলেন, 'সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থিমাংস, স্নায়ুপেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনো মতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই

আমি প্রত্যক্ষ করিলাম। ... শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই। কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশি করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে। মানুষের আত্মার সত্যপ্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষুধাতৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।'

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই রজনীকান্ত সেনের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর প্রাক্‌কালেও বারবার রবীন্দ্রনাথের নাম তিনি উচ্চারণ করেন, মনে মনে প্রণাম জানান কবিগুরুর চরণে।

রবীন্দ্রনাথকে সামনা-সামনি শেষ প্রণাম জানাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। দুজনের বয়সের ব্যবধান খুব বেশি নয়, তবু রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথকে গুরুজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন। রবীন্দ্রনাথও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এই একনিষ্ঠ আদর্শবাদী সাহিত্যসেবীর প্রতি।

রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ছাড়েন ১৯১৯ সালে। তার কিছুদিন পরেই রামেন্দ্রসুন্দর লোকান্তরিত হন। মৃত্যু আসন্ন জেনে রামেন্দ্র-সুন্দর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পাঠান রবীন্দ্রনাথের কাছে, অনুরোধ করেন, একটিবার তাঁর শেষশয্যার পার্শ্বে আসতে। তিনি বলেন, 'আমি উত্থানশক্তি রহিত। আপনার পায়ের ধূলা চাই।'

সংবাদ শোনা মাত্র রবীন্দ্রনাথ ছুটে আসেন রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে। তখন প্রভাতকাল। রবীন্দ্রনাথকে দেখে রামেন্দ্রসুন্দর উৎফুল্ল। মুহূর্তে রোগযন্ত্রণার কষ্ট মুখ থেকে দূর হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথকে বিছানার পাশে বসিয়ে তিনি অনুরোধ করেন, জ্বলন্ত দেশপ্রেমের স্বাক্ষর নাইটহুড ত্যাগের সেই চিঠিখানা যেন তাঁকে একটিবার পড়ে

শোনান। রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ চিঠিখানা আনিয়ে তাঁর দৃপ্ত অথচ স্নিগ্ধ কণ্ঠে রামেন্দ্রসুন্দরকে শোনান। শুনে রামেন্দ্রসুন্দর তৃপ্ত, মুগ্ধ। এই তাঁর জীবনের শেষ শ্রবণ।

বিদায় নেবার আগে রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, "আপনার পদধুলি চাই। কিন্তু আমি উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানাতে অপারগ। আপনার শ্রীচরণ আমার মাথার কাছে এগিয়ে দিন।" রবীন্দ্রনাথ পা এগিয়ে দিলেন এবং প্রণাম জানিয়ে কৃতার্থ হলেন রামেন্দ্রসুন্দর। এই তাঁর শেষ প্রণাম।

রবীন্দ্রনাথ চলে যেতেই তিনি নিদ্রাচ্ছন্ন হলেন। সেই নিদ্রাই হল মহানিদ্রা। রবীন্দ্রনাথকে শেষ দেখার পর পৃথিবীর আর কোন কিছুর দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেননি। এই তাঁর শেষ দর্শন।

১৯২৩ সাল। দুরন্ত কালাজ্বর রোগে আক্রান্ত সুকুমার রায়। বাঁচার আর কোন আশা নেই। তিনি শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন স্ত্রী সুপ্রভা দেবীর কাছে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখতে চান। রবীন্দ্রনাথ এলেন। যেমন এসেছিলেন প্রিয়শিষ্য এই সুকুমারের বিবাহ সভায়। রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হতেই মৃত্যুকে শিয়রে নিয়ে শয়ান রোগী আনন্দিত। তিনি রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন, 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' গানটি গাইতে। রবীন্দ্রনাথ গাইলেন। কিন্তু সুকুমার অতৃপ্ত। আবার ফরমাস করলেন, 'দুঃখ এ নয়, সুখ নয়গো, গভীর শান্তি এ যে' গানটি গাইতে। রবীন্দ্রনাথ গাইলেন। একবার নয়, দুবার। সারা ঘরে ধ্বনিত হল—'এত কালের ভয়-ভাবনা কোথায় যে যায় সরে, ভালোমন্দ ভাঙাচোরা আলোয় ওঠে ভরে।' সুকুমার রায়ের হৃদয়ও ভরে উঠল। সুকুমার রায় প্রণাম জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিদায় দিলেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষার অবসান এবং কিছুদিন পরেই জীবনাবসান।

রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন, "জীবলোকের উর্ধ্বে অধ্যাত্মলোক আছে। যে কোন মানুষ এই কথাটি নিঃসংশয়ে

বিশ্বাসের দ্বারা নিজের জীবনে সুস্পষ্ট করে তোলেন। অমৃতধামের তীর্থযাত্রায় তিনি আমাদের নেতা। আমার পরম স্নেহভাজন যুবক বন্ধু সুকুমার রায়ের রোগশয্যার পাশে এসে যখন বসেছি, এই কথাই বারবার আমার মনে হয়েছে। আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি, কিন্তু এই অল্প বয়স্ক যুবকটির মতো অল্পকালের আয়ুটিকে নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্য দান করতে প্রায় আর কাউকে দেখিনি। মৃত্যুর দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অসীম জীবনের জয়গান তিনি গাইলেন। তাঁর রোগশয্যার পাশে বসে সেই গানের সুরটিতে আমার চিত্ত পূর্ণ হয়েছে।'

মৃত্যুর সঙ্গে বার বার মুখোমুখি রবীন্দ্রনাথ এইভাবে অমৃতলোকের কথা বলে নিজেও সান্ত্বনা পেয়েছেন। দীর্ঘজীবনে বহু মৃত্যুশোক অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। কিন্তু তিনি আঘাতে ভেঙে পড়েন নি কোনদিন। এমনকি ব্যক্তিগত শোককে সামাজিক শোক করার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন। ১৯৩২ সালে জার্মানিতে কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবীর একমাত্র পুত্র এবং তাঁর একমাত্র দৌহিত্র নীতিন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ শান্তিনিকেতনে পৌছলে পূর্ব নির্দিষ্ট বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান বাতিল করে দেওয়ার প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ অগ্রাহ্য করে দেন। বর্ষামঙ্গল যথারীতি হয় এবং রবীন্দ্রনাথ তাতে যোগ দেন। আবার ১৯২৯ সালে জেলে অনশনে যতীন দাসের মৃত্যু সংবাদ এলে তিনি 'তপতী' নাটকের রিহার্সেল বন্ধ করে দেন। তারপরই এই মৃত্যু উপলক্ষে 'সর্ব খর্বতারে দহে' গানটি তৎক্ষণাৎ লিখে তপতী নাটকের সঙ্গে যুক্ত করেন। এই গানে তিনি বলেন, 'মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ।' —একথা শোকে অবিচল, দুঃখে অকাতর রবীন্দ্রনাথেরই।

দুর্ভোগা রবীন্দ্রনাথ



বাঙালী মনীষীদের মধ্যে প্রকৃত অর্থে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র দুই শতাব্দীর লোক। তাঁর আশী বছরের জীবনের অর্ধাংশ কেটেছে উনবিংশ শতাব্দীতে। বাকি অর্ধাংশ বিংশে। রামমোহন ছাড়া সেকালের কীর্তিমান বাঙালীদেব—বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল রামকৃষ্ণদেব, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখদের তিনি দেখেছেন। প্রায় সমসাময়িক সব খ্যাতিমান—বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যদুনাথ সরকার, জগদীশচন্দ্র বসু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী. বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ অথবা পরিচিত। উত্তরসূরী কনিষ্ঠ সুভাষচন্দ্র বসু, শিশির ভাদুড়ি, ফজলুল হক, নজরুল ইসলাম, তারাশংকর, বিভূতিভূষণ, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র এবং আরো অসংখ্য লোক পেয়েছেন তাঁর স্নেহ। তাছাড়া রবীন্দ্র পরিমণ্ডলীর ভিতর যাঁরা ছিলেন, যেমন সত্যেন দত্ত, অমল হোম, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, প্রশান্ত মহলানবিশ, প্রভাত মুখার্জি—তাঁদের কথা তো স্বতন্ত্র।

এদিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথ সৌভাগ্যবান। বিচিত্র

সব প্রতিভাধরের সঙ্গে পরিচয় তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু বন্ধুত্বের বিচারে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দুর্ভাগা আর কেউ নেই। অল্প দু-চারজন ব্যতিক্রম যেমন বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীন সেন, বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর পূর্বসূরী বা সমসাময়িক সকলেই কেমন যেন নীরব কিংবা নির্মম।

যেমন ধরুন, ডি এল রায়ের কথা। সমবয়সী দুই কবি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্যে কত চেষ্টাই না করেছেন। তাঁর সব রচনার তিনি গুণগ্রাহী। এমন কি দ্বিজেন্দ্রবিষয়ক যে বইয়ে রবীন্দ্রনাথের আদ্যন্ত শ্রাদ্ধ করা হয়েছে, সেখানেও তিনি ভূমিকা লিখে দেন বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। তাব পরিবর্তে ডি এল রায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথ পেলেন নিন্দা, অপবাদ, কুৎসা। চিত্তরঞ্জন দাশকে রবীন্দ্রনাথ ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন, নিজের বাড়িতে এনে তাঁর প্রিয় লুচি-মাংস খাওয়াতেন। আর সেই চিত্তরঞ্জনই ভাড়াটে লেখক লাগিয়ে তাঁর নারায়ণ কাগজে রবীন্দ্রনাথের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করেছেন। সুরেশ সমাজপতিকে স্নেহবশত তিনি বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে তাঁর যাবতীয় সংগ্রহ ও গবেষণা দান করে দিয়েছিলেন। আর সেই সমাজপতিই রবীন্দ্রনাথকে হেনস্থা করার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ কবিতা লিখেছেন, তাঁর পণ্ডিচেরি আশ্রমে গিয়েছেন, আরো অনেক শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়েছেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ ওগুলি প্রাপ্য বলেই গ্রহণ করেছেন, প্রতিদানে কিছু দেবার প্রয়োজন মনে করেন নি। অন্যে পরে কা কথা, জগদীশচন্দ্র বসু বা ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বা যদুনাথ সরকার—এই তিন ঘনিষ্ঠ বন্ধু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কত শ্রদ্ধাশীল, কত আন্তরিক। কিন্তু ওই তিন বন্ধু তো ততটা নন। জগদীশচন্দ্র বসুকে বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তাঁর কত চেষ্টা। কিন্তু জগদীশ বসু মশাই প্রতিদানে কোথায় কী করেছেন বা কী বলেছেন জানা যায় না। যদুনাথ সরকারকে রবীন্দ্রনাথ নিজের বই

উৎসর্গ করেছেন, সর্বত্র তাঁর জয় ঘোষণা করেছেন, অথচ যদুনাথ সরকার পরে রবীন্দ্রবিরোধীর দলেই যোগ দিয়েছিলেন। বিপিন চন্দ্র পাল তো প্রকাশ্যেই জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রপরবর্তী বহু প্রতিষ্ঠিত বাঙালীরও একমাত্র পবিত্র কর্তব্য ছিল রবীন্দ্রনাথকে নিন্দা করা। এখনো সেই ধারা সমাজে চলেছে। হয় নিন্দা, নয় অস্বীকার। অস্বীকারে আপত্তি নেই, কিন্তু নিন্দা কেন? তাঁর অপরাধ?

রবীন্দ্রনাথের বিশাল রচনা সম্ভারের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা বা স্নেহ জানিয়ে কবিতা, প্রবন্ধ বা সপ্রশংস মন্তব্য। এই তালিকায় আছেন বিদেশের শেকসপীয়ারও। আছেন দেশবিদেশের সব গুণিজ্ঞানী। কারো সম্পর্কে তিনি লিখেছেন বিরাট প্রবন্ধ, কারো সম্পর্কে লিখেছেন কবিতা। শ্রীঅরবিন্দ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জগদীশচন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ, রামকৃষ্ণদেব, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় প্রমুখ সম্পর্কে তাঁর কবিতা তো অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শেষ জীবনে চরম দারিদ্র্যের মুখে পড়েন। একমাত্র রবীন্দ্রনাথই তাঁর সীমিত আয় থেকে প্রতি মাসে অর্থ সাহায্য করে হেমচন্দ্রের সংসার খরচ মেটাতেন। তবু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে হেমচন্দ্রের একটি প্রশংসা বাক্যও উচ্চারিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তো এমন কিছু খারাপ লেখেন নি, এমন কিছু মন্দ মানুষও নন, তবু বিখ্যাত বাঙালীর অনেকেই এতো নিষ্ঠুর এতো শীতল কেন? নাকি এর পিছনে আছে পরশ্রীকাতরতা, আছে ঈর্ষা, আছে অহম্মন্যতা?

তবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার নিজের একটি নালিশও আছে। পূর্বসূরী, সামসাময়িক উত্তরসূরী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, স্নেহভাজন কত লোক সম্পর্কে তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পিতা, পিতৃব্য, ভ্রাতা

ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পৌত্র সম্পর্কেও তাঁর লেখনী মুখর। একমাত্র ব্যতিক্রম সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী প্রিন্স দ্বারকানাথ। পৌত্রসুলভ দু-একটি পরিহাস ছাড়া তিনি তাঁর পিতামহ সম্পর্কে আদৌ কিছু লেখেন নি বা বলেন নি। পিতা দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে রচনায় তিনি মুক্তহস্ত। সেটা স্বাভাবিক। অথচ বিচিত্র প্রতিভা ও শক্তির অধিকারী দ্বারকানাথ সম্পর্কে তাঁর নীরবতা অস্বাভাবিক ও অরাবীন্দ্রিক।

নতুন দাদার সঙ্গে



সহস্রাধিক রেখাচিত্র, শতাধিক সংগীত, অর্ধশতাধিক গ্রন্থ এবং একটি পরিপূর্ণ রবীন্দ্রনাথ যিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র সেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এখনো বঙ্গবাসীর কাছে বিস্ময়। বিস্ময়ের কারণ শুধু তাঁর অত্যাশ্চর্য প্রতিভা নয়, জীবনের সায়াহ্নে তাঁর স্বেচ্ছানির্বাসনও। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সবচেয়ে উচ্ছল এবং প্রাণবান এই সুদর্শন গুণধর কেন শেষ জীবনে রাঁচির মোরাবাদী শৈলে অগস্ত্যযাত্রা করলেন, কেন তাঁর সাহিত্য ও সংগীতের সহচর, প্রিয়তম কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন, আজও তা জিজ্ঞাসু গবেষকদের কাছে সম্পূর্ণ অগোচর। একদিকে বীরভূমের শান্তিনিকেতন, অন্যদিকে রাঁচির শান্তিধাম —দুই 'শান্তি'র মাঝখানে ভৌগোলিক দূরত্ব যত অল্পই হোক না কেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যতদিন জীবিত ছিলেন, বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ তালিকায় রাঁচি নামক মনোরম ভূখণ্ড কখনো স্থান পায়নি। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে জানতে পারি রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন—অধ্যাপক সিলভা লেভিকে নিয়ে রাঁচি যাওয়ার। কিন্তু তা' ঃ পরে হয়ে ওঠেনি। আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ? রবীন্দ্রনাথ স্থায়ীভাবে বসবাস করার আগে কতবার তিনি গিয়েছেন শান্তিনিকেতন, কিন্তু তারপর একবারও এই আশ্রম তাঁর প্রাণের আরাম মনের আনন্দ আত্মার

শান্তিরূপে ধরা দেয়নি। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর সবচেয়ে আনন্দিত হওয়ার কথা যাঁর, সেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি অভিনন্দন বার্তা পর্যন্ত পাঠাননি। পারিবারিক কলহ? খ্যাতির ঈর্ষা? কাদম্বরীদেবীর আত্মহত্যা? না, কোন কারণই দুই ভ্রাতার চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। ১৯১২ সালে কলকাতার কয়েকজন সাহিত্যিক যখন রাঁচিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান, প্রথম দর্শনেই তিনি আচমকা বলে ওঠেন, 'আপনারা আমাকে রবি ভাবেননি তো?'—এই অসতর্ক উক্তির মধ্যে ঈর্ষার বীজ লুকিয়ে থাকার ইঙ্গিত কেউ কেউ করলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানসিক গঠনের সঙ্গে এই রিপুটির সম্পর্ক আদৌ স্থাপন করা যায় না। বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের বেলায়। তাছাড়া তিনিই তো কথাচ্ছলে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ যাত্রা অসুস্থতাহেতু স্থগিত হওয়ায় আক্ষেপ করেন এবং মৃত্যুর আগে রবিকে দেখার জন্যে দিনরাত ছটফট করেন। শোনা যায়, শেষ দেখার জন্যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে রাঁচিতে আহ্বান জানান চিঠিতে। কিন্তু সে চিঠি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের হাতে পৌঁছয় না। নইলে জ্যোতিদাদার শেষ ডাকে তিনি কখনই নীরব থাকতে পারতেন না।

এই জ্যোতিদাদাই তো ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সব। বয়সের ব্যবধান বারো বছরের, কিন্তু মনের দিক থেকে দুইজনের কোন ব্যবধান ছিলো না। অযাচিত প্রেম ও অকৃপণ প্রশ্রয় তিনি পান এই সর্ববিদ্যাপারঙ্গম সর্বজনপ্রিয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে। চিত্রে সংগীতে নাট্যে অভিনয়ে সাহিত্য রচনায় ভাষা শিক্ষায় ব্যবসায়ে সংগঠনে স্বাদেশিকতায় এই অসাধারণ রূপবান মানুষটি সহজ প্রতিভার দীপ্তিতে ঠাকুরবাড়ি জ্যোতির্ময় ক'রে রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোনো বাঁধন পরান নি। তাঁর সঙ্গে

তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার 'পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন, তা'হলে ভেঙেচুরে তেড়েবেঁকে যা হয় একটা কিছু হতুম। সেটা হয়তো ভদ্রসমাজের সন্তোষজনকও হ'তো, কিন্তু, আমার মতো একেবারেই হ'তো না।' তাই প্রথমবারের ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনী 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' গ্রন্থের উৎসর্গে তিনি লেখেন, 'ভাই জ্যোতিদাদা, ইংলণ্ডে যাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত, তাহারই হস্তে এই এই পুস্তক সমর্পণ করিলাম।'

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন চোদ্দ, তখন থেকেই তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছায়াসঙ্গী। "সরোজিনী" নাটকের প্রুফ পড়ার সময় রবীন্দ্রনাথের মনে হয় উপসংহারে একটি সংগীত থাকা দরকার। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানিয়ে পিয়ানোয় আঙুলের ঝড় তোলেন, আর রবীন্দ্রনাথ ঝড়ের সঙ্গে বিদ্যুতের চমক লাগিয়ে মুখে মুখে সুরের কথা জোগান—'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ, পরান সঁপিবে বিধবাবালা।' কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিস্ময়কর পারদর্শিতায় মুগ্ধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেন, 'সরোজিনী প্রকাশের পর হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশন দিয়া আমাদের সমশ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সংগীত ও সাহিত্য চর্চাতে আমরা হইলাম তিনজন— অক্ষয় চৌধুরী রবি ও আমি।' ওই সময়ের সুখস্মৃতিচারণা ক'রে রবীন্দ্রনাথও বলেন, 'এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গীতে ঝমাঝম সুর তৈরি ক'রে যেতেন, আমাকে রাখতেন পাশে। তখনি তখনি ছুটে চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।'

এইভাবেই তৈরি হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের শেষ গান 'আয় তবে সহচরী', তৈরি হয়েছে বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়ার

গান এবং এইভাবেই আরো অন্তত কুড়ি পঁচিশটি রবীন্দ্রসংগীতের জ্যোতিরিন্দ্র-স্বর চাপা পড়ে আছে স্বরবিতানের পাতায়। দুই ভাই মিলে শুরু করেছিলেন সংগীতদ্রোহিতা। হিন্দুস্থানি বৈঠকী গানের গৎ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে বিলিতি সুরে, তৈরি হয়েছে স্কচ-ভূপালী কিংবা ইতালিয়ান-ঝিঁঝিট। গানের পর গান, পালার পর পালা। এই গানের ঝরণাতলাতেই জন্ম নিয়েছে পরবর্তীকালের রবীন্দ্রসংগীত। জন্ম নিয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্য। ইংরেজি, ফরাসি, সংস্কৃত এবং মারাঠি সাহিত্যে সুপণ্ডিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, অনুবাদ অজস্র ধারায় উৎসারিত হয়েছে প্রতিদিন প্রতিরাত্রি, আর সেই ধারায় নিত্য স্নান ক'রে নতুন রসের সন্ধান পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ছবি আঁকা আর অভিনয়ও চলেছে সমান তালে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজের নাটক মানময়ীতে ইন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের কালমৃগয়ায় দশরথ, রামনারায়ণ তর্করত্নের নবনাটকে নটী। প্রতি নাটকের কনসার্ট দলে হারমোনিয়াম বাজাতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তাছাড়া সমান দক্ষতায় বাজাতে পারতেন বেহালা, সেতার এবং অতি অবশ্যই পিয়ানো। সংগীত সাহিত্য চিত্রকলা ও অভিনয় চর্চার ষোলকলা পূর্ণ হ'লো কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শুভবিবাহের পর। ছিলেন দুই, হলেন তিন। মধ্যমণি রইলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

১৮৪৯ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যখন জন্ম, তখনও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দানসাগর যজ্ঞের জোয়ারে প্রিন্স দ্বারকানাথের ঐশ্বর্য নিঃশেষ হয়ে যায়নি। প্রচুর বৈভব এবং প্রচুরতর বিলাসের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শৈশব কাটে। ঐশ্বর্যবান ঠাকুরবাড়ির সবচেয়ে রূপবান এই বালকের আদি শিক্ষা বাড়ির ঠাকুর দালানের পাঠশালায়। সেই সঙ্গে চলে হীরা সিং পালোয়ানের কাছে কুস্তি শিক্ষা, মুগুর-ভাঁজা, এবং বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে সংগীত চর্চা। কুস্তি এবং সংগীতের

পাশাপাশি চলে সাঁতার, ঘোড়ায় চড়া এবং বন্দুক চালনা। চিত্রাঙ্কন-বিদ্যার হাতেখড়িও সেই সময়ে। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের ছিল একটি পিয়ানো। সেটি নাড়াচাড়া করতে করতে তিনি আয়ত্ত করেন এটি বিলিতি বাদ্যযন্ত্রের যাবতীয় কলাকৌশল। বেহালা আর হারমোনিয়াম বাজানোতেও হাত পাকালেন অল্প বয়সে। ঠাকুর দালানের পাঠশালা থেকে তিনি গেলেন সেণ্ট পল্স্ স্কুল। তারপর মণ্টেজ একাডেমি ও হিন্দু একাডেমি। অবশেষে প্রেসিডেন্সি কলেজ। সেখানে তাঁর সহপাঠী কবি নবীনচন্দ্র সেন।

রবীন্দ্রনাথের চিত্তের উদ্বোধন ঘটান যেমন নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, তেমনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিকাশ ঘটে আই. সি. এস. মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের আশ্রয়ে। প্রবাসী সত্যেন্দ্রনাথের ডাকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কখনো যান বোম্বাই, কখনো পুনা, কখনো কারোয়ার। সেখানে তাঁকে নানাবিদ্যায় কুশলী করতে সত্যেন্দ্রনাথ চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। নিজে এবং বন্ধু মনমোহন ঘোষ ভাইকে শেখান ফরাসি ভাষা, মারাঠা পণ্ডিত রাখা হয় মারাঠা ভাষা শেখাতে এবং একজন গুজরাটি ওস্তাদ নিয়মিত শেখান সেতার। অবনীন্দ্র-নাথের জ্যাঠামশাই গণেন্দ্রনাথকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্রাংশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

১১.৫.৬৭ : জ্যোতি আমার নিকট ফরাসী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছে। আমি তাহার জন্য একজন ড্রয়িং মাষ্টারও নিযুক্ত করিয়া দিয়াছি। কিন্তু জ্যোতি পারিবে কি না জানি না।

২.৬.৬৭ : জ্যোতি সেতার শিক্ষা করিতেছে।

৪.৯.৬৭ : জ্যোতি সেতার শিখিতেছে। ইহাই তাহার একমাত্র আমোদ।

বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংগীত চর্চা নিয়ে

চমৎকার একটি ছড়া বাঁধেন। সেই সময়—

বেয়ালা কী মিঠে অমৃতের ছিটে

ঐ হাতটিতে শুনায়

পিয়ানো ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং

সেতার গুনগুনায়।

মহারাষ্ট্র-প্রবাস জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের ভিত্তি তৈরির কাল। মলিয়ের, গতিয়ের, কালিদাস, শেক্সপিয়ার, তুকারাম থেকে এতো অনুবাদ এবং সংগীতে ও চিত্রাঙ্কনে এতো বৈচিত্র্য সত্যেন্দ্রনাথের অভিভাবকত্ব না থাকলে এতো অনায়াসে হ'তো না। তাছাড়া সংগঠন শক্তির শিক্ষাও সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পরিচালিত বিভিন্ন সংস্থার তালিকা যেমন বিচিত্র, তেমনি বিপুল। তিনি ছিলেন আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক, বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য সারস্বত সমাজের ও ভারত সংগীত সমাজের প্রতিষ্ঠাতা, স্বাদেশিকতার মন্ত্র উচ্চারণের জন্য সঞ্জীবনী সভার পৃষ্ঠপোষক। 'ভারতী' পত্রিকা তাঁরই সৃষ্টি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন নামে সম্পাদক। যাবতীয় পরিকল্পনা ও কাজকর্মের ভার ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতে। কল্পনা বালক সাধনা এবং ভারতীতে তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক। প্রথম হিন্দু মেলায় পড়েন উদ্বোধন নামক কবিতা, দৃপ্তকণ্ঠে সভাস্থলে বলেন—জাগ জাগ জাগ সব ভারত সন্তান, মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান। হাটখোলায় পাটের আড়ত খুলেছিলেন তিনি। শিলাইদহে শুরু করেছিলেন নীলের চাষ। তাছাড়া বরিশালে স্বদেশী স্টিমার চালাতে গিয়ে হন সর্বস্বান্ত। বিলিতি কোম্পানিগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে যাত্রী ভাড়া কমাতে কমাতে অবশেষে যাত্রী আকর্ষণের জন্য ভাড়া নেওয়ার বদলে মাথা-পিছু টাকা দেওয়া শুরু হ'ল, তখনই ধ'রে নেওয়া হয়েছিল এই স্টিমার কোম্পানিই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সর্বনাশ ঘটাবে। স্বদেশিয়ানা দেখানোর জন্য বাড়িতেই তিনি দেশী তাঁত খোলেন এবং সেই তাঁতে

প্রস্তুত নৈকষ্য স্বদেশী একমাত্র গামছা মাথায় বেঁধে তিনি আনন্দে সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। শোলার টুপি ও পাগড়ি লাগানো এবং পাজামা-ধুতির মিশ্রণে তৈরি স্বদেশী পোশাকও তাঁর সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে বলেছেন 'জ্যোতিদাদা অম্লানবদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন। আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত। তিনি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে, এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল।'

নাট্যরচনা, রঙ্গালয় স্থাপন ও অভিনয়—এই তিনদিকেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভা প্রসারিত করেন। এই ব্যাপারে তাঁর সহযোগী ছিলেন তাঁর খুল্লতাত ভ্রাতা এবং অবনীন্দ্রনাথের পিতা গুণেন্দ্রনাথ। দু'জনে ছিলেন হরিহর আত্মা। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর গুণীভাইদের নিয়ে যে-কবিতা রচনা করেন, তাতেও গুণেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পাশাপাশি—

ভাতে যেথা সত্য হেম মাতে যথা বীর,
গুণ জ্যোতি হরে যেথা মনের তিমির।
নব শোভা ধরে যেথা সোম আর রবি,
সেই দেব নিকেতন আলো করে কবি।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি। সেখানে অভিনীত হয়েছে মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী, একেই কি বলে সভ্যতা, নাটুকে রামনারায়ণের নব নাটক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানময়ী, পুরুবিক্রম, এমন কর্ম আর করব না ইত্যাদি। প্রত্যেকটি নাটকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পুরুষ বা নারী চরিত্রে অভিনয় করেন। 'অলীকবাবু' চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রথম অভিনয় এমন কর্ম আর করব না নাটকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক দেখেই নিয়মিত দর্শক বঙ্কিমচন্দ্র

মন্তব্য করেন, 'এরূপ কৃতবিদ্য এবং মার্জিতরুচি মহাশয়গণ যদি নাটক প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।' শুধু নাটক প্রচার নয়, সংগীত প্রচারের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন সংগীতবিষয়ক দু'খানি পত্রিকা—বীণাবাদিনী এবং সংগীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা। দ্বিজেন্দ্রনাথ সৃষ্ট বাংলা স্বরলিপি মার্জনা ক'রে আকার-মাত্রিক স্বরলিপিও প্রচার করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এই বিষয়ে প্রথম বই তাঁরই 'স্বরলিপি গীতিমালা'।

পরিণত বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রধান আলোচ্য ছিল ফ্রেনলজি বা শিরোমিতিবিদ্যা। 'সাধনায়' তিনি প্রবন্ধ লেখেন 'আধুনিক মস্তিষ্কবিদ্যা ও ফ্রেনলজি'। বালকে তাঁর প্রবন্ধ 'মুখচেনা। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রামগোপাল ঘোষ, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখের চরিত্র বিশ্লেষণ তিনি করেছেন তাঁদের মুখের ও মাথার গড়ন দিয়ে। এই বিদ্যার অনুশীলন করতে গিয়ে তিনি এঁকেছেন শতশত রেখাচিত্র। তাছাড়া আরো শতশত ছবি প্রাণবন্ত হয়েছে তাঁর তুলিতে বা পেনসিলে। বাছাই করা সেই সব ছবির একটিমাত্র এলবামই বেরিয়েছে বিলেতে। সংকলক রটেনস্টাইন। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, আই নো অভ্ ফিউ মডার্ন ড্রয়িংস হুইচ শো গ্রেটার বিউটি অ্যাণ্ড ইনসাইট।' এই এলবাম প্রকাশের পিছনে ছিল রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ।

এতসব কর্মকাণ্ডের মাঝখানেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জমিদারি পরিচালনা করতে গিয়েছেন কটক, গিয়েছেন শিলাইদহ। হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে তিনি বন্দুক হাতে প্রায়ই বেরিয়ে পড়তেন বাঘ শিকারে। পদ্মায় সাঁতারকাটা ছিল তাঁর নিয়মিত অভ্যাস। পিয়ানো বাজানোর মতো ঘোড়ায় চড়া ছিল তাঁর একটি সাবলীল প্রক্রিয়া। ১৮৬৮ সালে কাদম্বরী দেবীকে বিবাহের পর নববধূকে ঘোড়সওয়ার ক'রে তিনি গড়ের মাঠে যেতেন হাওয়া খেতে। গান-বাজনা নাটক অভিনয় সাহিত্য শিক্ষা শিকার ব্যবসা এবং বিদূষী

রূপসী সহধর্মিনীতে উজ্জ্বল এই জীবনে একমাত্র অভাব ছিল সন্তানের। সে অভাব পূর্ণ হয়েছিল স্ত্রী কাদম্বরী দেবী আর ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে। কিন্তু এতো সুখ কারো জীবনে সহ্য হয় না। ১৮৮৪ সালে কাদম্বরী দেবী করলেন আত্মহত্যা। রবীন্দ্রনাথ হলেন উদভ্রান্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সর্বকর্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে হলেন আত্মস্থ। ১৯০৫ সালে পিতৃবিয়োগের তিন বছর পর তিনি চিরকালের মতো চ'লে গেলেন রাঁচিতে। এবং সতেরো বছরের নিঃসঙ্গ একক জীবনের সমাপ্তি ঘটল ১৯২৫ সালে।

এই স্বেচ্ছানির্বাসনকালেও তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিল পিয়ানো। এই যন্ত্রটি যদৃচ্ছা মন্থন ক'রে তিনি সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতেন ওই নির্জন শৈলশিখরে। তাঁরই ভাষায় 'আর যৌবনের সে তেজ ও ক্ষমতা নাই। এখন কোনো রকমে অভ্যাসটা রক্ষা করা। এ একটা ব্যাধির মতো দাঁড়াইয়াছে।' তাঁহার সে সময়কার দেহচিত্রের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনীকার বসন্ত-কুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি লিখছেন—'দেখিলাম দীর্ঘ ঋজু কৃশ গৌরবর্ণ একটি মূর্তি আমাদের সম্মুখে। সে মূর্তি প্রসন্ন হাস্যোজ্জ্বল কোমল। তাঁহার কণ্ঠস্বর মৃদু অথচ স্নেহভরা। ললাট প্রশস্ত, নাসা উন্নত, মুখশ্রী সৌম্য, সরল এবং প্রতিভাদীপ্ত। সেই সুস্পষ্ট স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে শুভ্র পায়জামা এবং পাঞ্জাবি পরিহিত, ততোধিক স্নিগ্ধ ও কান্তবর্ণ মূর্তি দেখিয়া স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের আবির্ভাব মনে করিয়া আমরা দুইজনেই কিছুক্ষণ বাক্য হারাইয়া বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।'

স্ত্রী-বিয়োগ, পিতৃবিয়োগ, তারপর একের পর এক শোকের আঘাত। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ, বড়দিদি সৌদামিনী দেবী এবং ছোটবোন শরৎকুমারীর পর পর মৃত্যু জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে বিমর্ষ ক'রে তোলে। তিনি বোন স্বর্ণকুমারীকে এক চিঠিতে লেখেন—'মেজদাদা গেলেন, দিদি গেলেন, শরৎ গেলেন। একে একে সবাই আমাদের

ছেড়ে চ'লে যাচ্ছেন। পুরাতন বন্ধু-বান্ধব আর একজনও নেই। এইবার আমার পালা।'

আবার একটু পিছন ফিরে তাকাই। ১৯৭০ শকের শ্রাবণ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল: গত ২৩ আষাঢ় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চমপুত্র শ্রীমান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যার যথাবিধি ব্রাহ্মধর্মের পদ্ধতি অনুসারে শুভবিবাহ সমারোহপূর্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ সভায় বহু সংখ্যক ব্রাহ্ম এবং এতদ্দেশীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপক ব্রাহ্মণ সকল উপস্থিত ছিলেন। দরিদ্রদিগকে প্রচুর ভক্ষ্যভোজ্যে পরিতৃপ্ত করিয়া বিস্তর অর্থ প্রদান করাও হইয়াছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তখন উনিশ এবং নববধূ কাদম্বরীর বয়স নয়। অসামান্য সুন্দরী এই বালিকা বধূ জোড়াসাঁকো বাড়ির অন্দর মহলে এসে পেলেন প্রচুর আদর, প্রচুর ঐশ্বর্য এবং সাত বছরের বালক দেবর রবীন্দ্রনাথকে। রূপবতী গুণবতী কাদম্বরী মুহূর্তে হয়ে গেছেন নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের সবকর্মের সহচরী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাদম্বরী ও রবীন্দ্রনাথ—এই তিনজনে মিলে তৈরী হ'ল নতুন জগৎ—ঠাকুর বাড়ির মধ্যেই আর এক বাড়ি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রূপার রেকাবিতে বেলফুলের গোড়েমালা ভিজে রুমালে, পিরিচে এক গ্লাস বরফ দেওয়া জল, আর বাটাতে ছাঁচিপান। বউঠাকরুণ গা ধুয়ে, চুল বেঁধে, তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা। বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া সুরের গান। গলায় যেটুকু সুর দিয়েছিলেন বিধাতা, তখনও তা ফিরিয়ে নেননি। সূর্য-

ডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান। হু হু করে দক্ষিণে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে, তারায় তারায় যেত আকাশ ভরে।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দিনের বেলা থাকেন বাহির মহলে। অন্দর মহলে তখন নতুন বৌঠান আর ছোট দেওরে সখ্য। স্নেহ ভালোবাসার ভিতর দিয়ে ওঁরা দুজন বড়ো হন। নতুন বৌঠানকে খুশি করার জন্যে রবীন্দ্রনাথ লেখেন নতুন নতুন কবিতা, গেয়ে শোনান গান।—'বউ ঠাকরুন এলেন, ছাদের ঘরে বাগান দিল দেখা। উপরের ঘরে এল পিয়ানো, নতুন নতুন সুরের ফোয়ারা ছুটল। পূর্বদিকের চিলেকোঠার ছায়ায় জ্যোতিদাদার কফি খাওয়ার সরঞ্জাম হ'তো সকালে। সেই সময়ে পড়ে শোনাতেন তাঁর কোন একটা নতুন নাটকের প্রথম খসড়া। তার মধ্যে কখনও কখনও কিছু জুড়ে দেবার জন্য আমাকেও ডাক পড়ত আমার অত্যন্ত কাঁচা হাতের লাইনের জন্যে। ক্রমে রোদ এগিয়ে আসত—কাকগুলো ডাকাডাকি করত উপরের ছাদে বসে রুটির টুকরোর 'পরে লক্ষ্য করে। দশটা বাজলে ছায়া যেত ক্ষয়ে, ছাতটা উঠত তেতে।

'দুপুর বেলায় জ্যোতিদাদা যেতেন নিচের তলার কাছারিতে। বউ ঠাকরুণ ফলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে যত্ন করে রূপার রেকাবিতে সাজিয়ে দিতেন। নিজের হাতের মিষ্টান্ন কিছু কিছু থাকত তার সঙ্গে, আর তার উপরে ছড়ানো হত গোলাপের পাঁপড়ি। গেলাসে থাকত ডাবের জল কিংবা ফলের রস কিংবা কচি তাল শাঁস বরফে-ঠাণ্ডা করা। সমস্তটার উপরে একটা ফুল কাটা রেশমের রুমাল ঢেকে মোরাদাবাদী খুঞ্চেতে করে জলখাবার বেলা একটা-দুটোর সময় রওনা করে দিতেন কাছারিতে।'

বাইরে বেড়াতে বেরোলেও ওঁরা একসঙ্গে তিন সঙ্গী। গঙ্গার ধারে চন্দননগরে কিংবা শৈলশিখর দার্জিলিঙে কিংবা সুদূর বোম্বাইয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে যান রবীন্দ্রনাথ। তিনি

দাদা-বৌদির আনন্দসঙ্গী। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেন—'গঙ্গার ধারের প্রথম যে-বাসা আমার মনে পড়ে, ছোটো সে দোতালা বাড়ি। নতুন বর্ষা নেমেছে। মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রোতের উপর ঢেউ খেলিয়ে। মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ওপারের বনের মাথায়। অনেকবার এই রকম দিনে নিজে গান তৈরি করেছি, সেদিন তা' হল না। বিদ্যাপতির পদটি জেগে উঠল আমার মনে—এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর। নিজের সুর দিয়ে ঢালাই করে রাগিনীর ছাপ মেরে তাকে নিজের ক'রে নিলুম। গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে করা এই বাদল-দিন আজও রয়ে গেছে আমার বর্ষা গানের সিন্দুকটাতে। মনে পড়ে থেকে থেকে বাতাসের ঝাপটা লেগেছে গাছগুলোর মাথার উপর, ঝুটোপুটি বেধে গেছে ডালে-পাতায়, ডিঙি নৌকো গুলো সাদা পাল তুলে হাওয়ার মুখে ঝুঁকে পড়ে ছুটছে, ঢেউগুলো ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে ঝপ্ ঝপ্ শব্দে পড়ছে ঘাটের উপর। বউ ঠাকরুন ফিরে এলেন, গান শোনালুম তাঁকে, ভালো লাগল বলেন নি, চুপ করে শুনলেন। তখন আমার বয়স হবে ষোল কি সতেরো।......

'ঐ মোরান-বাগানের কথায় মনে পড়ে—এক একদিন রান্নার আয়োজন বকুল গাছ তলায়। সে রান্নায় মসলা বেশি ছিল না, ছিল হাতের গুণ। মনে পড়ে, পইতের সময় বউঠাকরুন আমাদের দুই ভাইয়ের হবিষ্যান্ন রেঁধে দিতেন, তাতে পড়ত গাওয়া ঘি। ঐ তিন দিন তার স্বাদে তার গন্ধে মুগ্ধ করে রেখেছিল লোভীদের।'

রবীন্দ্রনাথ গেলেন বিলেত। সেখানেও ঘুরে ফিরে স্মৃতিতে আসেন জ্যোতিদাদা আর বউঠাকরুণ। বিলেত থেকে ফিরে আবার আশ্রয় নিলেন দাদাবৌদির স্নেহক্রোড়ে। সাহিত্যে সংগীতে আমোদে প্রমোদে বল্গাহীন উদ্দাম জীবন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র তখন আরো প্রসারিত। নাটক লেখা ছবি আঁকা জমিদারি পরিচালনা নিয়ে তিনি বাইরে মহাব্যস্ত। নিঃসন্তান কাদম্বরী দেবীকে অহোরাত্র

সঙ্গ দেন দেবর রবীন্দ্রনাথ। ওদিকে আই. সি. এস. মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের বিরজিতলাওয়ের বাড়িতে আর একটি আনন্দ-আসর। সেই আসরের মধ্যমণি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং সকল আনন্দের উৎসাহদাত্রী গৃহকর্ত্রী মেজবৌঠান জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনেক সময় কাটে মেজবৌঠানের স্নেহছায়ায় বিরজিতলাওয়ের বাড়িতে। জোড়াসাঁকো বাড়িতে তিন সঙ্গী তখন দুই সঙ্গী হয়ে যান। তারপর রবীন্দ্রনাথের বিবাহ। তেতলার সেই গৃহে সংসার পাতলেন কবিপত্নী মৃণালিনী। নতুন জীবন, নতুন আনন্দ। কাদম্বরী দেবী হ'লেন আরো নিঃসঙ্গ। এমন সময় ঠাকুরবাড়িতে ঘটল মহাঅঘটন। ভরা যৌবনে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে কাদম্বরী দেবী করলেন আত্মহত্যা, শোকের আঘাতে কাদম্বরী দেবীর সুখের সংসার ভেঙে হয়ে গেলো চুরমার।

কেন এই আত্মহত্যা? এই নিয়ে নানা জিজ্ঞাসা নানা গবেষণা। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্রনাথের বিবাহের পূর্বে কাদম্বরী দেবী আর একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলছেন, 'এই অসামান্য নারী ছিলেন যেমন অভিমানিনী, তেমনি সেনটিমেণ্টাল এবং আরো বলিব ইনট্রোভার্ট, সিজোফ্রেনিক। অপরদিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও দোষত্রুটির উর্ধ্বে ছিলেন না। পত্নীর প্রতি যতটা মনোযোগী থাকিলে তাঁহার নিঃসন্তান জীবনের সঙ্গীহীন শূন্যতা কিছুটা পূরণ হইতে পারিত, তদ্বিষয়ে উদাসীনতাই দেখা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যৌবনে নাট্যকার ও অভিনেতার খ্যাতি অর্জন করিয়া রঙ্গমঞ্চের নটনটীদের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া অপবাদ শোনা যায়। জানিনা, এইরূপ কোনো সন্দেহের বশবর্তী হইয়া এই অভিমানিনী রমনী আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা।'

প্রভাতকুমারের এই অনুমান সত্য ব'লে মনে হয় না। তবে উদাসীনতার অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা নিয়ে নানারকম জল্পনা আগেও ছিল, এখনো আছে। এ সম্পর্কে অমল হোম একটি বিবরণ দিয়েছিলেন। তিনি নাকি বিবরণটি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের ছোটদিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর কাছ থেকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ধোপার বাড়িতে দেওয়া জোব্বার পকেটে সেইদিনের একজন বিখ্যাত অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার পরিচায়ক কতকগুলি চিঠি পাওয়া যায়। সেই চিঠিগুলো পেয়ে কাদম্বরী দেবী ক'দিন বিমনা হয়ে কাটান। সেই চিঠিগুলোই তাঁর আত্মহত্যার কারণ এই কথা নাকি কাদম্বরী দেবী লিখে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই লেখাটি ও চিঠিগুলো সবই মহর্ষির আদেশে নষ্ট ক'রে ফেলা হয়।

কাজি আবদুল ওদুদের অনুমান অন্যরকম। তিনি বলছেন, 'ঠাকুরবাড়ির একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির মুখে শুনেছি যে-মহিলার সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল তিনি অভিনেত্রী ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে এই অন্তরঙ্গতার জন্য কাদম্বরীর দেবী আরও একবার (রবীন্দ্রনাথের বিবাহের পূর্বে) আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন।'

কে এই মহিলা? কোথাও কোন সদুত্তর নেই, সবই অনুমান। তেমনি আর একটি অনুমান, মেজবৌঠান জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও তাঁর সন্তানদের নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একদিন স্টিমার ভ্রমণে যান। কথা ছিল সন্ধ্যার মধ্যে ফেরার। কিন্তু স্টিমার চড়ায় আটকে যাওয়ায় তিনি ফিরতে পারেন নি। সেই অভিমানেই প্রাণত্যাগ করেন কাদম্বরীদেবী।

অনুমানে অনুমানে ঠাকুর পরিবারের এই দুর্ঘটনা নানারকম সন্দেহকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। এমনকি একথাও বলা হয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ এই আত্মহত্যার কারণ। অতি অবান্তর প্রগল্‌ভ উক্তি। তবে একথা সত্য রবীন্দ্রনাথ সংসারী হওয়ার পর কাদম্বরী দেবীর নিঃসঙ্গতা বেড়ে যায়। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর কাছে আমি নিজে আর একটি ভাষ্য শুনেছি। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুকালে ইন্দিরা দেবীর বয়স ছিলো তেরো। সুতরাং সে সময় তিনি নিতান্ত

শিশু ছিলেন না। তিনি বলেছেন, আত্মহত্যার কিছুদিন আগে কাদম্বরী দেবীর জন্মদিন ছিল। তিনি স্বামীকে বলেছিলেন সেই রাত্রে বাড়িতে থাকতে। প্রতিশ্রুতি দিয়েও তিনি যথারীতি অন্যান্য দিনের মতোই বিরজিতলাওয়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর বাড়িতে চ'লে যান এবং ফেরেন বেশ পরে। এবং ফেরার পরও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার জন্য স্ত্রীর কাছে দুঃখ প্রকাশ পর্যন্ত করেননি। জন্মদিন ব্যাপারটাই তিনি বিস্মৃত হয়ে যান। অভিমানিনী কাদম্বরী দেবী প্রচণ্ড আঘাত পান। সম্ভবত অতীতেও এমন ঘটনা ঘটেছে এবং সেদিনের ঘটনায় পরিণাম হয় ভয়ঙ্কর। কাদম্বরী দেবী গোপনে বিশু নাম্নী এক কাপড়ওয়ালির মারফৎ সংগ্রহ করেন আফিম এবং তাই খেয়ে একদিন সব জ্বালা জুড়ান। ইন্দিরা দেবী একথাও বলেন 'জ্যোতিকাকা মশাই বিরজিতলাওয়ে আমাদের সঙ্গেই বেশিক্ষণ কাটাতেন। নতুন কাকিমা (কাদম্বরী দেবী) হয়ত সেটা খুব পছন্দ করতেন না।'

মোট কথা, শেষদিকে স্ত্রীর প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদাসীনতা আত্মহত্যার কারণ ব'লে ধরে নেওয়া যেতে পারে। স্ত্রীর প্রতি অমনোযোগের অন্যতম কারণ হয়তো নিঃসন্তানতা। তাই জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও তাঁর সন্তানদের প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এতো আকর্ষণ ছিল। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরও দেখি, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী দেবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে নিয়ে স্টিমার ভ্রমণে বেরিয়েছেন। উদ্দেশ্য শোকের আঘাত লাঘব করা। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সমবয়সী। বিবাহের পর থেকেই দুজনে ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থা বিবেচনা ক'রেই জ্ঞানদানন্দিনী দেবী দেবরকে সঙ্গদান করা কর্তব্য ব'লে বিবেচনা করেছিলেন।

সে যাইহোক, ঠাকুরবাড়ির এই শোকের আঘাত সামলে উঠতে অনেকদিন লেগেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেকে অনেক গুটিয়ে

নিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদক পদ ছেড়ে দিলেন, রবীন্দ্রনাথ প্রেরিত হলেন জমিদারি পরিদর্শনে। শিলাইদহ থেকে অবশেষে শান্তিনিকেতনে। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অনুসরণ করলেন জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ স্টোর রোডে গৃহ নির্মাণ করে জোড়াসাঁকো থেকে নিজেকে করলেন বিযুক্ত। ইতিমধ্যে পরলোক গমন করেছেন মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ। চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের দেখা দিলো মস্তিষ্ক বিকৃতি। সপ্তম পুত্র সোমেন্দ্রনাথও আক্রান্ত হলেন মানসিক ব্যাধিতে। নিঃসন্তান ও বিপত্নীক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কার্যত নিঃসঙ্গ পড়ে রইলেন বিশাল পরিবারের বিশাল বাড়িতে। পিয়ানোর ঝঙ্কার স্তব্ধ, বেহালা ধূলিমলিন, সাহিত্য বা নাটকের সূত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রও অনুপস্থিত। নিশিদিনের সঙ্গী হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে আমৃত্যু রয়ে গেল শুধু চিত্রাংকন। তবু মহর্ষি যতদিন জীবিত ছিলেন, জোড়াসাঁকোর সঙ্গে বন্ধন সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়নি তাঁর পুত্রকন্যাদের।

মহর্ষির মৃত্যু হ'ল ১৯০৫ সালে। ঠাকুরপরিবারের বন্ধন এবার শিথিল হয়ে গেলো। পিতার উইল অনুযায়ী জমিদারির মালিক হলেন মাত্র তিন পুত্র—দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। নিঃসন্তানতা হেতু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মাসোহারা নির্দিষ্ট হ'লো মাত্র বারোশত টাকা। সেই সামান্য অর্থ সম্বল ক'রে পিতার মৃত্যুর তিন বছর পর ১৯০৮ সালে তিনি চিরবিদায় নিলেন জোড়াসাঁকো থেকে, বানপ্রস্থ নিলেন রাঁচির মোরাবাদী পাহাড়ে নবনির্মিত শান্তিধামে। সঙ্গে নিয়ে গেলেন নিঃসঙ্গতা, নিয়ে গেলেন স্মৃতি।

সেই নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যে মাঝে মাঝে শান্তি দিয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর দুই পৌত্র পৌত্রী—সুবীরেন্দ্রনাথ ও মঞ্জুশ্রী। এই দু'জন ছিলেন তাঁর বার্ধক্যের সম্বল। তাছাড়া দু' একবার গিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ। কিন্তু যৌবনের আনন্দসহচর, শিষ্য, ভ্রাতা, বন্ধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্ক

এক অজ্ঞাত রহস্যময় কারণে ছিন্ন হয়ে যায়। শান্তিধাম ও শান্তিনিকেতনে কোন সম্পর্কই রইল না। এমন কি পত্রালাপও হয়ে গেলো বন্ধ। স্বামীর উদাসীনতা হেতু নতুন বৌঠানের আত্মহত্যার জন্য রবীন্দ্রনাথ কি জ্যোতিদাদাকে কখনো ক্ষমা করতে পারেন নি? নাকি সাহিত্যে সংগীতে স্নেহের রবির জ্যোতিহীন একক প্রয়াস ও খ্যাতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে অভিমানী করেছিল অন্তরে অন্তরে?

কিছুই জানার উপায় নেই। কোন তথ্যই কেউ রেখে যাননি কিসের অভিমানে জীবনের শেষ সতেরোটি বছর রাঁচির নির্জনতায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেকে সমর্পণ করলেন। ১৯২৫ সালে মৃত্যুর প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথকে শেষবারের মতো দেখার ব্যাকুলতা, 'রবি-রবি' বলে বিলাপ রবীন্দ্রনাথের কানে কেনই বা পৌঁছে দেওয়া হ'লো না? কিংবা জেনে শুনে কেন রবীন্দ্রনাথ পাষাণ হয়ে রইলেন? অথচ তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক বছর পর পরলোকচর্চাকালে মিডিয়ামে জ্যোতিদাদাকে বারবার এনেছেন রবীন্দ্রনাথ, জিজ্ঞাসা করেছেন নতুন বৌঠানের সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হয় কিনা। জ্যোতিদাদার কাছে তাঁর ঋণের কথা, জ্যোতিদাদার স্নেহের কথাও তো নানা স্মৃতিকথায়, নানা চিঠিপত্রে বারবার উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের শেষ জীবনের উক্তিতেও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্নেহের অভাব নেই। তবু না জানি কী ছিল বিধাতার মনে, দুই প্রিয় ভ্রাতার মধ্যে বিচ্ছেদ বিষণ্ণ ক'রে রেখে দিয়েছে শেষ জীবনের কয়েকটি বছরকে। বিষণ্ণ করেছে আমাদেরও।

তবু তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুবিশাল প্রতিভায় বিশ্বের বিচিত্র কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে দিক্ হ'তে দিগন্তরে ছুটে চ'লে যান জীবনশিল্পী হয়ে; আর প্রিয়জনবিযুক্ত বৈভববিমুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শৈলবাসী সন্ন্যাসী সেজে তিলে তিলে নিজেকে ঠেলে দিলেন আত্মবিলোপের দিকে। এ-ও তো এক প্রকার আত্মহত্যা।

জগৎ কবিসভায় রবি



রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল প্রাইজ পেলেন, তার আগে তিনি একজন বাঙালী লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। বঙ্গদেশখ্যাত এই কবি কী ভাবে বিশ্বখ্যাত হলেন, কীভাবে ইউরোপের গুণিসমাজ তাঁকে বরণ করে নিলেন, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার প্রাক্কালে কী ঘটনা ঘটল, জানতে হলে আমরা ফিরে যাব ১৯১২ সালের ১৬ই জুনে। কবি এই তৃতীয়বার এলেন লণ্ডনে। সেই কবে যৌবনে এসেছিলেন দু'বার।—বিয়ের আগে সতেরো বছর বয়সে প্রথমবার বিদ্যার্থী হিসাবে, দ্বিতীয়বার বিয়ের পর উনত্রিশ বছর বয়সে বেড়াতে। এবার অন্য চিত্র। আগেকার সেই প্রগলভ কিশোর বা ভাবুক যুবকের চিহ্নমাত্র নেই, এখন তিনি দীর্ঘশ্মশ্রুসমন্বিত পঞ্চাশোত্তীর্ণ খ্যাতিমান পুরুষ, প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার, ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের আশ্রমগুরু, বরেণ্য সাহিত্যিক। যৌবনের চোখ দিয়ে দেখা সেই লণ্ডনও আর নেই। কবিরূপমুগ্ধা কিশোরী লুসি-র দেখা নেই, নেই পূজনীয় শিক্ষক প্রফেসার মলি, নেই সেই নাচের আসর গানের আসর।

এবার সঙ্গে এসেছেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমাদেবী। পাঁচ বছর আগে তাঁদের বিয়ে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পত্নী পরলোকে, পরলোকে মধ্যমা কন্যা রেণুকা, কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ এবং পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ। বাংলাদেশ তখন রবীন্দ্রানুরাগী আর রবীন্দ্রবিরোধী দুটি ভাগে আলাদা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় প্রত্যক্ষভাবে

রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে নিজেকে আবার গুটিয়ে নিয়েছেন কবি। কলকাতা-বাসের পাট কার্যতঃ তুলে দিয়ে যাতায়াত করতে লাগলেন শিলাইদহে আর শান্তিনিকেতনে, সোনার তরী চিত্রা কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে উত্তীর্ণ হলেন গীতাঞ্জলি গীতিমাল্যের অধ্যাত্মস্বর্গে। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় আর জমিদারী পরিচালনার সঙ্গে সমানতালে চলেছে সংগীতরচনা। এমন সময় এল বিদেশের ডাক। কবি পাড়ি দিলেন ইংলণ্ডে।

রবীন্দ্রনাথ যখন লণ্ডনে এলেন, তখন কয়েকজন রবীন্দ্রানুরাগী বাঙালী ছাত্র হিসাবে লণ্ডনে রয়েছেন। সুকুমার রায়, কালীমোহন ঘোষ, কেদার চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দমোহন বসু। তা ছাড়া নানা কাজে উপস্থিত নববিধান সমাজের ভাই প্রমথলাল সেন, দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এঁরা সবাই রবীন্দ্রনাথের প্রীতিভাজন এবং বন্ধু। তা ছাড়া লণ্ডনে আছেন আর একজন পরিচিত। তিনি বিশ্বখ্যাত চিত্রশিল্পী রটেনস্টাইন। অনেকদিন আগে তিনি এসেছিলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে, ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথের অতিথি হয়ে। তিনি এই ইংরেজ চিত্রশিল্পীর কাছে পরিচিত হয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথের খুল্লতাত হিসাবে। তাছাড়া মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় ভগিনী নিবেদিতা অনূদিত কাবুলিওয়ালা গল্প পড়ে তিনি মুগ্ধ হন এবং পরে আক্ষেপ করেন, প্রথম পরিচয়ের সময়ই রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মাল না কেন।

লণ্ডনে পৌঁছেই রবীন্দ্রনাথ হ্যাম্পস্টীড হীদে ২ নং হলফোর্ড রোডে এক বাড়ি ভাড়া করলেন এবং রটেনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে দিলেন একখানা পাণ্ডুলিপি। জাহাজে আসার সময় এবং আগে গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য খেয়া নৈবেদ্য থেকে বেশ কিছু কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। সরল গদ্যে স্বচ্ছন্দ ভাষান্তর। 'সঙ্‌স্ অফারিং নামাঙ্কিত এই পাণ্ডুলিপিটি রটেনস্টাইনকে উৎসর্গ করা।

পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে ইতিমধ্যে এক কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ লণ্ডনে পাতাল রেলে কোথা থেকে যেন আসছিলেন। রথীন্দ্রনাথের হাতের এটাচিতে ছিল ওই পাণ্ডুলিপি। নির্দিষ্ট স্টেশনে তড়িঘড়ি নামার সময় রবীন্দ্রনাথ ট্রেনের কামরাতেই ফেলে গেলেন পাণ্ডুলিপি সমেত এটাচি কেস। খেয়াল হল বাড়িতে ফেরার পর। রবীন্দ্রনাথকে ব্যাপারটা না জানিয়ে সারা রাত ছটফট করে কাটান রথীন্দ্রনাথ। কী সর্বনাশ, যদি ফেরত না পাওয়া যায়? তাহলে তো কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত! পরদিন সকালে দুরু দুরু বক্ষে পাতাল রেলের অফিসে বৃত্তান্ত পেশ করার পর মিসিং ডিপার্টমেণ্টে পেয়ে গেলেন সাত রাজার ধন এক মানিক মহা মূল্যবান ওই এটাচি।

সে যাই হোক, ইতিমধ্যে রটেনস্টাইন ইংরেজি গীতাঞ্জলির কয়েকখানা টাইপকরা কপি পাঠিয়ে দিলেন তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে। তার মধ্যে আছেন উইলিয়াম বাটলার ইয়েট্স্। ইংরেজি সাহিত্য ও ইংলণ্ডের চিন্তাধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দীর্ঘদিনের। এবার তিনি পরিচিত হতে চাইলেন সমসাময়িক চিন্তাবিদদের সঙ্গে। রটেনস্টাইনের কাছে এই ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্র এইচ. জি. ওয়েলস এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখের সঙ্গে আলোচনাব ব্যবস্থা তিনি করে দিলেন। ওয়েলস রবীন্দ্রনাথ থেকে বয়সে কিছু ছোট। দু'জনে পরিচিত হলেন নৈশভোজে। রবীন্দ্রনাথ তার আগেই ওয়েলসের অনেক বই পড়ে ফেলেছেন। প্রথমে কবির মনে কিঞ্চিৎ ভয় ছিল না জানি কী ভাবে ওয়েলস তাঁকে গ্রহণ করবেন। পরে দেখা গেল ওয়েলস রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ। আর রবীন্দ্রনাথও পরে বললেন, ওয়েলসের প্রখরতা চিন্তায়, প্রকৃতিতে নয়।

কেম্ব্রিজের কিংস কলেজে তখন আছেন অধ্যাপক লোয়েস ডিকিনসন। তাঁরই লেখা 'জন চীনাম্যানের পত্র' নামক বইয়ের সহৃদয় সমালোচনা বঙ্গদর্শনে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ডিকিনসনের

সঙ্গে পরিচয়ের পর রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "যে দুই দিন ইঁহার বাসায় ছিলাম ইঁহার সঙ্গে প্রায় নিয়ত আমার কথাবার্তা হইয়াছে। স্রোতের সঙ্গে স্রোত যেমন অনায়াসে মেশে, তেমনি অশান্ত আনন্দে তাঁহার চিত্তবেগের টানে আমার চিত্ত ধাবিত হইয়া চলিতেছিল।" তখনই পরিচয় হয় রাসেলের সঙ্গে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ইংলণ্ডের ভাবুক সমাজ নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রাসেল ও ডিকিনসনের সঙ্গে আলাপ সম্পর্কে লেখেন—"গণিতের তেজে কাহারও মন দগ্ধ হইয়া যায়, কাহারও মন আলোকিত হইয়া উঠে। রাসেল সাহেবের মন যেন প্রখর আলোকে দীপ্যমান। সেই চিন্তার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে অপর্যাপ্ত হাস্যরশ্মি মিলিত হইয়া আছে, সেইটি আমার কাছে সবচেয়ে সরস লাগিল। রাত্রে আহারের পর আমরা কলেজের বাগানে গিয়া বসিতাম। সেখানে একদিন রাত্রি এগোরাটা পর্যন্ত প্রাচীন তরু-সভার গভীর নীরবতার মধ্যে এই দুই অধ্যাপক বন্ধুর আলাপ আমি শুনিতেছিলাম। . . . নিস্তব্ধ রাত্রে দুই বন্ধুর মৃদুকণ্ঠের কথাবার্তায় আমি মানুষের মনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের সেই আনন্দ সেই ঐশ্বর্য অনুভব করিতেছিলাম।

ডিকিনসন নিজেও এই মিলন-সভার একটি চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন পরে :—It is a June (1912) evening, in Cambridge garden Mr. Bertrand Russel and myself sit there alone with Tagore. He sings to us some of his poems, the beautiful voice and the strange mode floating away on the gathering darkness. Then Russel begins to talk, coruscating like lighting in the dusk. Tagore falls into silence. But afterwards he said, it had been wonderful to hear Russel talk. He had passed into a higher state of consciousness and heard it.

as it were, from a distance. What, I wonder, had he heard ?

ওদিকে রটেনস্টাইন গীতাঞ্জলির টাইপকরা কপি বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন প্রতিক্রিয়ার। শেক্সপীয়ারের অসামান্য সমালোচক ব্রাডলে পাণ্ডুলিপি পড়ে লিখে পাঠালেন—It looks as though we have at last a great poet among us again. যশস্বী লেখক স্টপফোর্ড ব্রুক জানালেন—I send back the poems. I have read them with more than admiration ; with gratitude for their spirtual held, and for the joy they bring and confirm and for the love of beauty which they deepen and for more than I can tell, I wish I were worthy of them.

ব্রুক ছিলেন মহারানী ভিকটোরিয়ার পুরোহিত। ধর্মশাস্ত্রী ছাড়াও তিনি পরিচিত ছিলেন সেকালের খ্যাতনামা লেখক হিসাবে। রবীন্দ্রনাথ ব্রুকের সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় থাকতে ব্রুকের প্রচুর লেখা পড়েছেন। ব্রুকও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আগ্রহী। রটেনস্টাইনের মধ্যস্থতায় দুই মনীষীতে দীর্ঘক্ষণ আলাপ হল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে পরে লিখেছেন—"ইহার শরীর-মনে বার্ধক্য তাহার জয়পতাকা তুলিতে পারে নাই। আশ্চর্য ইহার নবীনতা। আমার বারবার মনে হইতে লাগিল, বৃদ্ধের মধ্যে যখন যৌবনকে দেখা যায়, তখনই তাহাকে সকলের চেয়ে ভালো করিয়া দেখা যায়। কেননা, সেই যৌবনই সত্যকার জিনিস।"

ওদিকে রটেনস্টাইনের বাড়ির সাহিত্য আসরে ইংরেজি গীতাঞ্জলি নিয়ে তুফান চলছে। ১৯১২ সালের ৭ই জুলাই একটি সাহিত্যসভা বসল। সভার মধ্যমণি রবীন্দ্রনাথ। আমন্ত্রিতদের মধ্যে আছেন ইয়েটস্, আর্নেস্ট রাইজ, মিস সিনক্লেয়ার, এভেলিন আনডারহিল,

রবার্ট ট্রেভেলিন, ফক্স-স্ট্রাংওয়েজ, এজরা পাউণ্ড, মিজ্যাল, এণ্ডরুজ এবং আরো অনেক বাছা বাছা সাহিত্যরথী ও সমালোচক। ইয়েটস্ গীতাঞ্জলি থেকে কয়েকটি কবিতা নিজেই পড়ে শোনালেন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ, সকলেই বাক্‌শূন্য। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলেন, নতুন তারকার আবির্ভাব হয়েছে পূর্বাকাশে।

সাহিত্যিক মহলে প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হল রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে। সেই আলোড়ন আরো ব্যাপ্ত হল ১২ই জুলাই ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে ট্রোকাডোরা হোটেলে বিরাট রবীন্দ্র-সম্বর্ধনার পর। এই সোসাইটিই তার কিছুদিন পর ইংরেজি গীতাঞ্জলির বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে প্রাচ্যের কবিকে পরিচিত করে দেন। ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা হ্যাভেল, রটেনস্টাইন, মিঃ ও মিসেস হেরিংহাম, টমাস আর্নলণ্ড, রজার ফ্রাই প্রমুখ। ইণ্ডিয়া সোসাইটির দিন দুই আগে অবশ্য ইউনিয়ন অব ইস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট নামক সমিতির উদ্যোগে এমার্সন ক্লাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা 'ভাণ্ডার' পত্রিকা সম্পাদনা-কালে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী কেদারনাথ দাশগুপ্ত।

ট্রোকাডোরা হোটেলের সম্বর্ধনা সভায় সভাপতি ছিলেন কবি ইয়েটস্। উপস্থিত ছিলেন সেকালের সব সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক। এইচ জি ওয়েলসও এসেছিলেন। ইয়েটস্ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন—"একজন শিল্পীর জীবনে সকলের চেয়ে বড় ঘটনার দিন সেইটি যেদিন তিনি এমন একজন প্রতিভার রচনা আবিষ্কার করেন যার অস্তিত্ব তিনি আগে জানতেন না। আমার কাব্যজীবনে আজ একটি মহৎ ঘটনা উপস্থিত। আজ আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্বর্ধনা ও সম্মান জানাবার ভার পেয়েছি। তাঁর লেখা প্রায় একশটি গীতিকবিতার অনুবাদের একখানি খাতা আমি সব সময় সঙ্গে নিয়ে ফিরছি। আমার সমকালীন এমন কোন ব্যক্তিকে আমি জানি না —যিনি এমন কোন রচনা ইংরেজিতে প্রকাশ করেছেন—এই

কবিতাগুলির সঙ্গে যার তুলনা চলতে পারে।"—ইত্যাদি ইত্যাদি। ইয়েটস্ সভাতেই অনুবাদিত তিনটি কবিতা পড়ে শোনান—শ্রাবণঘন গহন মোহে, জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যেক্ষণে এবং মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। অভিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথও একটি বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন—

"আজ এই সন্ধ্যায় আপনারা আমাকে যে সম্মানে সম্মানিত করলেন, আমার ভয় হয়, যে ভাষার মধ্যে আমি জন্মগ্রহণ করিনি, সে ভাষায় আপনাদের ধন্যবাদ জানাবার যথেষ্ট ক্ষমতা আমার নেই। আশা করি, আপনারা আমাকে মার্জনা করবেন। আপনাদের এই গৌববান্বিত ভাষায় যদিও আমার সামান্য জ্ঞান আছে. তবু আমি কেবল আমার নিজের ভাষাতেই ভাবতে পারি এবং অনুভব করতে পারি। আমার বাংলা ভাষা অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণা গৃহিণীর মতো বরাবর আমার সমস্ত সেবা দাবি করে আসছেন এবং তার রাজ্যে আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের অনধিকারপ্রবেশকে তিনি প্রশ্রয়মাত্র দেননি। সেইজন্য আমি কেবলমাত্র আপনাদের স্পষ্ট করে বলতে পারি যে, এদেশে আসা অবধি যে নিরবচ্ছিন্ন প্রীতি দ্বারা আপনারা আমাকে গ্রহণ করেছেন, তা আমাকে এত মুগ্ধ করেছে যে, আমি প্রকাশ করে বলতে পারি না।"

এই বক্তৃতার পর সাড়া পড়ে যায় সারা ইংলণ্ডে। হাউস অভ কমনসে তৎকালীন সহসচিব, পরে সেক্রেটারি অভ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া মণ্টেগু ভারতের বাজেট আলোচনাকালে কবির বক্তৃতাব উল্লেখ করেন। দৈনিক টাইমস লেখেন উচ্ছ্বসিত সম্পাদকীয়, মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান মন্তব্য করেন—"রবীন্দ্রনাথের আগমনে এদেশের সম্মান, সম্ভ্রম, প্রশংসা ও কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে এবং রসিকসমাজে যে সাড়া পড়েছে, এমনটি এ যুগের লোকের জীবদ্দশায় কোন প্রাচ্য অতিথির জন্য হতে দেখা যায়নি।"

চারদিকে স্তুতি, চারদিকে প্রশংসা। ইংলণ্ডের যেখানে যান,

সেখানেই কবিকে নিয়ে ভিড়। এই খ্যাতির বিবরণ ইউরোপ আমেরিকায় পৌঁছয়। একে রবীন্দ্রনাথের ঋষিপ্রতিম উন্নতদর্শন মূর্তি, তদুপরি একেবারে ভিন্নজাতের অ-সাধারণ লেখা—সব মিলিয়ে রাতারাতি তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবির সম্মানে অধিষ্ঠিত করে ফেলল।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ এক গ্রামে গেলেন জনৈক পাদরির অতিথি হয়ে। নিমন্ত্রণকর্তা সিপাহী বিদ্রোহের যুগের ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল উট্রামের পুত্র। বাটাটন গ্রাম থেকে কবি গেলেন গ্লস্টার-শায়ারে রটেনস্টাইন পরিবারের সঙ্গে চ্যালফোর্ড নামক গ্রামে। আগস্টে ফিরলেন লণ্ডন। ফ্ল্যাট নিলেন অ্যালফ্রেড প্লেসে। সেখানেই ঘনিষ্ঠতা হয় এণ্ডরুজের সঙ্গে। ইতিমধ্যে গীতাঞ্জলি ছাপার ব্যবস্থা সম্পূর্ণপ্রায়। ইয়েটস্ লিখলেন ভূমিকা। ভূমিকা পড়ে রবীন্দ্রনাথ লজ্জিত, বলেন, "এটা আমার মূল্যবান অলংকার সন্দেহ নেই, কিন্তু যাকে বলে অতিশয়োক্তি অলংকার।"

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে অন্য কবিতা ও বইয়ের অনুবাদও শুরু করেন। দালিয়া গল্পের ইংরেজি অনুবাদ করেন কেদারনাথ দাশগুপ্ত এবং নাট্যরূপ দেন নামকরা নাট্যকার জর্জ কলডেরন। 'দি মহারানী অব আরাকান' নামে দালিয়া গল্প অভিনীত হয় এলবার্ট থিয়েটারে। চিত্রাঙ্গদা, মালিনী, রাজা ও ডাকঘরের অনুবাদও চলছে। 'গার্ডনার' নাম দিয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন বই। সম্বর্ধনা আর রচনায় রবীন্দ্রনাথ মহাব্যস্ত। রটেনস্টাইন এসব নাটকের অনুবাদ রবার্ট ট্রেভেলিয়ানকে দেখতে দেন। রাজা অনুবাদ করেন তখনকার কেমব্রিজের ছাত্র, পরে জজ ক্ষিতীশচন্দ্র সেন এবং ডাকঘর অনুবাদ করে অক্সফোর্ডের ছাত্র দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ হলেন অসুস্থ। অর্শের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত। এলোপ্যাথ অপারেশনে অনিচ্ছা প্রকাশ করে আমেরিকার খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথ ডাঃ ন্যাসের চিকিৎসার জন্য অক্টোবরে পাড়ি দিলেন

মার্কিন মুলুক। সঙ্গে পুত্র ও পুত্রবধূ। সেই প্রথম তাঁর আমেরিকায় যাত্রা। নিউইয়র্কে কিছুদিন থেকে গেলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ক্ষেত্র ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্বানায়। সেখানে পরিচিত হলেন বিদগ্ধ সমাজের সঙ্গে। বক্তৃতাও দিলেন নানা বিষয়ে নানা জায়গায়। আর্বানায় থাকতেই খবর পেলেন 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়েছে এবং এবার আর ইণ্ডিয়া সোসাইটি নয়, ম্যাকমিলান কবির সব বই প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। গীতাঞ্জলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হই-হই পড়ে গেল। টাইমসের লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সমালোচনা লিখলেন গীতাঞ্জলির।

আর্বানা থেকে রবীন্দ্রনাথ গেলেন শিকাগো। সেখানে অতিথি হলেন হ্যারিয়েট মনরোর। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দিলেন কয়েকটি বক্তৃতা। মনরো সম্পাদিত 'পোয়েট্রি' পত্রিকার প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যায় গীতঞ্জলিব ছ'টি কবিতা ছাপা হয়। এজরা পাউণ্ড মনরোকে লেখেন—"ভেবি বিউটিফুল ইংলিশ উইথ মাস্টারি অভ ক্যাডেন্স।"

শিকাগো থেকে রচেস্টাব। সেখানে আলাপ হয় জার্মান দার্শনিক রুডলফ ক্রিস্টোফার অয়কেনের সঙ্গে। রচেস্টার থেকে আবার নিউইয়র্ক। সেখানে অতিথি মিসেস মুডির। মুডির সঙ্গে গেলেন বস্টন। পাশেই ক্যামব্রিজ। সেখানে বক্তৃতা দিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। রবীন্দ্রনাথের নাম শুনে দেখা করতে আসেন ব্রিটিশ কবি আলফ্রেড নয়েস। বস্টন থেকে আবার শিকাগো।

আমেরিকায় ছয় মাস কাটিয়ে কবি ফিরলেন লণ্ডনে। গীতাঞ্জলির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ। ডাকঘব অভিনয় হচ্ছে আইরিশ থিয়েটারে। রাজা লিটল থিয়েটারে। এসেই তিনি ক্যাক্সটন হলে দিলেন ছয় সপ্তাহে ছ'টি বক্তৃতা। এই বক্তৃতাবলীই 'সাধনা' নামে পরে প্রকাশিত। কবি আর্নেস্ট রাইজের ভাষ্যেই জানা যায়, এই ছয়টি বক্তৃতা ইংলণ্ডের শিক্ষিত সমাজে কী আলোড়নই না তুলেছিল।

এই বিপুল অভ্যর্থনার মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ অর্শের অপারেশনের জন্য ভরতি হলেন নার্সিং হোমে। আমেরিকার হোমিওপ্যাথি কাজ দেয়নি। দু' সপ্তাহ তিনি হাসপাতালে ছিলেন। ফুলের মালা আর অতিথির ভিড় লেগে থাকত হাসপাতালে। সে সময় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও বিলাতে আসেন। তিনি রোজ যেতেন 'রবিকাকা'কে দেখতে।

১৯১৩ সালের জুলাইয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই তিনি ঠিক করলেন জার্মানি যাবেন। কবি কাইজারলিং নিমন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু জার্মানি যাওয়া হল না। দেশের জন্যে মন আকুল হয়ে উঠল। ১৯১৩ সালের ৪ সেপ্টেম্বর কবি সিটি অভ লাহোর জাহাজে দেশে রওনা হলেন লিভারপুল থেকে। সঙ্গে কালীমোহন ঘোষ ও সুকুমার রায়। ৪ অক্টোবর জাহাজ ভিড়ল বোম্বাইতে। ৬ অক্টোবর কবি ফিরলেন কলকাতা।

কবি তো চলে এলেন। ওদিকে ইংরেজি গীতাঞ্জলী নিয়ে হইচই চলছে ইউরোপে। টাইমসে সমালোচনা লিখলেন এডমণ্ড গস, পোয়েট্রিতে লিখলেন এজরা পাউণ্ড। পাউণ্ডের অভিমত 'ইংরেজি কাব্যে, এমন কি পৃথিবীর কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে গীতাঞ্জলির প্রবেশ একটি বিশেষ ঘটনা। মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে লিখলেন লাসেল আবেরকোম্বি। ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালিতেও একই উচ্ছ্বাস একই সমাদর।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে অনেকে আবার সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন, ইংরেজিটা সত্যি সত্যি রবীন্দ্রনাথের কিনা। এত ভালো একজন বাঙালী লেখেন কী করে? কেউ কেউ বললেন, নাম আছে বটে রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু আসল লেখক স্বয়ং ইয়েটস্। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অজস্র সাক্ষ্যের দরকার নেই, রটেনস্টাইন তাঁর আত্মজীবনীতে কী লিখেছেন শোনা যাক। তিনি বলেছেন—I knew that it was said in India that the success of

Gitanjali was largely owing to Yeats's rewriting of Tagore's English. That this is false can easily be proved. The original manuscript of Gitanjali in English and in Bengali is in my possession. Yeats did here and there suggest slight changes, but the main text was printed as it came from Tagore's hands.

সে যাই হোক গীতাঞ্জলী নিয়ে উত্তেজনার ঢেউ পৌঁছল সুইডেনে। ১৯১২ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত হয় ইংরেজি গীতাঞ্জলি। তার ঠিক এক বছর পর ১৯১৩ সালের নবেম্বরে ঘটল সেই ঐতিহাসিক ঘটনা। লণ্ডনের রয়্যাল একাডেমির সদস্য স্টার্জ মুর নোবেল প্রাইজের জন্য রবীন্দ্রনাথের নাম সুপারিশ করলেন সুইডিশ একাডেমির কাছে। ফরাসী সাহিত্যিকরা নাম পাঠালেন এমিল ফগে-র। একাডেমির সদস্যদের মধ্যে দেখা দিল মতানৈক্য। কিন্তু বেশীর ভাগই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে! সুইডিশ লেখক পার হলস্টর্মের ইচ্ছে রবীন্দ্রনাথ এই পুরস্কার পান। তাছাড়া আর একজন খ্যাতনামা সুইডিশ কবি হাইডেনস্টাম জোর ওকালতি করলেন গীতাঞ্জলির জন্য। তিনি একাডেমির সভায় বক্তৃতা দিয়ে বললেন—Now that we have finally found an ideal poet of really great stature, we should not pass him over. For the first time and perhaps for the last for a long time to come, it would be vouchsafed us to discover a great name before it has appeared in all the newspapers. If this is to be achieved, however, we must not tarry and miss the opportunity be waiting till another year.

একাডেমির অন্যতম সদস্য এজাইজ টেগনার। তিনি বাংলা

পড়তে পারতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের বাংলা রচনার সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। সব মিলিয়ে অবশেষে একাডেমির কাছে বিচারের জন্য হাজির হল একমাত্র গীতাঞ্জলিই। কমিটির সভাপতি ডঃ হারাল্ড হর্নে সরকারীভাবে ঘোষণা করলেন, গীতাঞ্জলিকে ১৯১৩ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল।

তার পরের ঘটনা সকলের জানা। দেশে বিদেশে উত্তেজনা, চাঞ্চল্য। ইংরেজ কেউ কেউ বললেন, হার্ডি বেঁচে থাকতে কালা আদমি রবীন্দ্রনাথ কেন? ফ্রান্সের বক্তব্য, আনাতোল ফ্রাঁস বাদ গেলেন কেন? জার্মানির অভিযোগ, তাদের রোজেগ্‌গর বাতিল হলেন কোন্ দোষে? অর্থাৎ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং প্রাইজ পাওয়ার পর ধনীদের মুখপত্রের গলা অন্য রকম হয়ে গেল।

বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল দেশেও। অনেকে বলতে লাগলেন, রবীন্দ্রনাথ ঘুষ দিয়ে পুরস্কারটা মেরে দিয়েছেন। কেউ বললেন, তিনি অন্যের লেখা নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। আবার অনেকে নিজেদের লেখা ইংরেজিতে অনুবাদ করে সুইডেনে পাঠাতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ যদি নোবেল প্রাইজ পেতে পারেন, তবে ওঁরা নয় কেন? অবশ্য রবীন্দ্রানুরাগীদের মধ্যে হই-হই পড়ে গেল। নতুন ভক্তও সৃষ্টি হল সেই মুহূর্ত থেকে।

অনেকেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজের পুরো এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা তাঁর জমিদারি পরিসরে চাষীদের সমবায় ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে সব খুইয়েছেন। সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানাতে শান্তিনিকেতন গিয়ে কলকাতার অতিথিরা কবির তিক্ত ভাষণ শুনে বিষণ্ণ হয়ে ফিরে যান, কিন্তু সম্ভবতঃ অনেকেই জানেন না, কলকাতাবাসীর কাছে সুসংবাদটি প্রথম পরিবেশন করেছিল কে? করেছিল 'এম্পায়ার' নামে একটি সান্ধ্য দৈনিক। ১৩ নবেম্বর কাগজটি লেখে—It is the first recc-

gnition of the indigenous literature of this Empire as a world force; it is the first time that an Asiatic has attained distinction at the hands of the Swedhish Academies and this is first occassion upon which the £8000 prize has been awarded to a poet who writes in a language to entirely forign the awarding country is to Sweden.

রবীন্দ্রনাথ তখন কোথায় ছিলেন? তিনি ছিলেন শান্তি-নিকেতনে। ৯ নবেম্বর বিদ্যালয় খুলেছে পূজাবকাশের পর। ছাত্র ও অধ্যাপকদের সঙ্গ পেয়ে কবি আনন্দিত। ১৫ নবেম্বর তিনি রথীন্দ্রনাথ ও দীনেন্দ্রনাথকে নিয়ে মোটরে চৌপাহাড়ি শালবনে বেড়াতে যাবেন বলে স্থির করেছেন, এমন সময় টেলিগ্রাম এল কলকাতা থেকে—১৯১৩ সালের নোবেল প্রাইজ তিনি পেয়েছেন। টেলিগ্রাম প্রেরক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। শুভবার্তাটি প্রথমে খোলেন কবির কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। রান্নাঘরে ছাত্র, অধ্যাপক, আশ্রমিক সবাই যখন খেতে বসেছেন, তখনই তিনি ঘোষণা করলেন এই চাঞ্চল্যকর সংবাদ। সারা আশ্রমে তৎক্ষণাৎ আনন্দ-উৎসবের শুরু।

তিনদিন পর, অর্থাৎ ১৯১৩ সালের ১৮ নবেম্বর রটেনস্টাইনকে লিখলেন একখানা চিঠি। পুরস্কারপ্রাপ্তির সংবাদে সবাগ্রে মনে হয়েছে এই বন্ধুটির কথা। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—যখনই নোবেল প্রাইজের খবর পেলাম, তখনই আমার অন্তর আপনার প্রতি ভালবাসায় ও কৃতজ্ঞতায় ধাবিত হয়েছিল। আমি জানি, আমার বন্ধুদের মধ্যে এই সংবাদে আপনার মতো তৃপ্ত আর কেউ হবেন না……।

এই চিঠিতেই তিনি আরো লেখেন—গত কয়েকদিনের টেলিগ্রাম ও চিঠির চাপে আমি শ্বাসরুদ্ধ। যে সব লোকের আমার প্রতি

বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই বা যারা আমার রচনার একটি লাইনও পড়েন নি, তাঁরাই আনন্দজ্ঞাপনে বেশী মুখর। এই সব উচ্ছ্বাস আমাকে যে কী পরিমাণ ক্লান্ত করছে, আমি তা বলতে পারি না। এই অবাস্তবতার আধিক্য ভয়াবহ।

আম্রকুঞ্জের সম্বর্ধনা সভায় এই ধরনের রবীন্দ্র-অজ্ঞ বা রবীন্দ্র-বিদ্বেষী লোকদের প্রথম সারিতে দেখেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই তিক্ত ভাষণে বলেছিলেন—"এই সম্মানের সুরাপাত্র ওষ্ঠে ঠেকাব, কিন্তু এই মদিরা অন্তরে গ্রহণ করতে পারব না।"

সে অন্য ইতিহাস। নোবেল প্রাইজ পাওয়া নিয়ে সারা পৃথিবীতে চলল আলোড়ন, কবি নিজে শান্ত সমাহিত। রূপলোক আর রসলোকে আবর্তিত হয়ে তিনি আপনমনে করে যান সৃষ্টির পর সৃষ্টি। বঙ্গকবি ততদিনে বিশ্বকবি। জগৎকবিসভায় আমরা বাঙালীরা গর্বিত।